অনশ্বর

॥১॥

রামলালের চাকরিটা গেল।

এমন কিছু নয়, সামান্য ত্রিশ টাকা মাইনের গ্রাম্য বালিকা বিদ্যলয়ের হেড্ পণ্ডিতের পদ। কিন্তু আজকাল নতুন কি সব নিয়ম হয়েচে গবর্নমেন্টের, যাট বছর বয়েস হলে স্কুলের চাকরিতে আর নাকি রাখা চলবে না। এ সব আবার কি নতুন ফ্যাঁসাদ, এতকাল মাস্টারি করে আসচে রামলাল, কখনো শোনেনি বয়েসের সঙ্গে এর আবার সম্পর্ক আছে। যাই হোক, রামলাল গিয়ে ধরবে ভাবলে সাব ইন্সপেক্টর বাবুকে মহকুমার টাউনে।

রামলাল রুগ্ণ স্ত্রীকে বললে—সকাল সকাল দুটো ভাত দিতে পারবে হ্যাঁগা? একবার গিয়ে ধরি ইন্স্পেক্টর বাবুকে। দেখি কি হয়।

বড় ছেলে শ্যামলাল হল এই অঞ্চলের স্থানীয় কবি। ছোটখাটো সাহিত্যসভা থেকে নিমন্ত্রণ আসে, শ্যামলাল সভার মাঝে দাঁড়িয়ে উঠে কবিতা পড়ে, সবাই হাততালি দেয়, গ্রামের লোকে সুখ্যাতি করে। সে দু'বছর কলেজে পড়েছিল, অর্থাভাবে পরীক্ষা দেওয়া হয়নি, আর পড়াও হয়নি। সে কিন্তু ছেলে ভালো, পড়াশুনোর দিকে খুব ঝোঁক এবং সত্যিই কবি-প্রকৃতির। সকলে তাকে ভালোবাসে, বলাবলি করে পিতার দারিদ্র্যের জন্যে এমন ছেলেটার কিছু হল না। শ্যামলালের ঝোঁক পরোপকার করা—লোকের বাড়ির ক্রিয়াকর্মে সে আগে থেকে গিয়ে কাঁধ দেবে, খাটা-খাটুনি করবে, পরিবেশন করবে, গরিব পরিবারের জন্যে মুষ্টিভিক্ষা তুলে বেড়াবে—কিন্তু নিজের সংসারে বিশেষ কোনো কাজে লাগে না সে। অনেক সময় বসে আকাশপাতাল ভাবে, কি করলে বাবার অবস্থা ভালো করা যায়, অবিশ্যি তার বাবা ভালো হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন এবং বাবার চিকিৎসায় তার খুব বিশ্বাস—কিন্তু এসব অঞ্চলে কেশব ডাক্তারেরই পসার। তার বাবাকে কেউ ডাকে না, রাত-দুপুরে হাতের কাছে অন্য ডাক্তার না পেয়ে তাকে যারা ডাকে, তারা পয়সা দেয় না।

বেলা দুটোর সময় রামলাল সাব্-ইনস্পেক্টর বাবুর বাসায় গিয়ে হাজির হল। বাইরের ঘরে দু'তিনজন লোক বসে আছে, তাদের একজনকে রামলাল চেনে, ঘাটবাঁওড় পাঠশালার সেকেন্ড পণ্ডিত রিদয় ভট্টাচার্যি।

রামলাল ওর পাশে বেঞ্চিতে বসে বললে, ও রিদয়, ভালো আছ?

রিদয়ের বয়েস ষাটের কাছাকাছি, মাথার চুল সব সাদা, রোগা লম্বাটে চেহারা, সামনের দুটো দাঁত বেজায় উঁচু—নস্যি নেবার অভ্যেস থাকায় নাসিকা-গহ্বরে নস্যির গুঁড়ো লেগে আছে। রামলালের দিকে চেয়ে নীরস মুখে বললে—মন্দ না।

—এখানে কি মনে করে?

—তুমি কি মনে করে?

—দরকার।

—আমারও তাই।

—আমার না হয় চাকরি নেই, তোমার তো তা নয়।

—এ কোয়ার্টারের মাইনের বিল পাঠিয়ে দিইচি মাসখানেক আগে, এখনো টাকা পাইনি— কি খাই বললা দিকি?

এ পাশের ছোকরা-গোছের লোকটি বললে—আমারও তো তাই।

রামলাল তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—তোমাকে তুমিই বলি, আমার ছেলের বয়সী তুমি। কোন্ ইস্কুলে চাকরি কর?

—লালমোহন একাডেমি, সুন্দরপুর।

—কি, পণ্ডিত?

—আজ্ঞে আমি হেডমাস্টার।

রিদয় ভট্টাচার্যি বললে—ওঁকে চেন না, ওঁর নাম সুধাংশুবাবু, উনি বি. এ পাশ।

রামলাল অবাক হয়ে বললে—তবে তো বড় অন্যাই হয়ে গিয়েছে আপনাকে তুমি বলে ? কিছু মনে করবেন না সুধাংশুবাবু।

সুধাংশুবাবু বললেন—না না, আমাকে তুমিই বলুন না। সত্যিই তো আপনি আমাদের বাপের বয়িসী।

—এই বয়েসে হেডমাস্টার? বাঃ বাঃ, সোনার টুকরো ছেলে। আমার বড় ছেলের বয়িসী বলেই তুমি বললাম। তা আপনারও কি বিল-পাশের হাঙ্গামা?

—তা ছাড়া আর কি বলুন! আপনি কোন্ ইস্কুলের?

—মেটেরা ফ্রি বালিকা বিদ্যালয়।

এমন সময় সাব-ইন্সপেক্টর বাবু নিজে এসে ঘরে ঢোকাতে এদের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল। সাব-ইন্সপেক্টর বাবুর বয়েস চল্লিশের বেশি নয়, বেশ ফরসা, সুন্দর চেহারা, চোখে সোনার চশমা। তিনি এসে সকলকে হাতজোড় করে নমস্কার করে প্রথমেই সুধাংশুবাবুকে সম্বোধন করে বললেন—আপনার কি খবর?

সকলেই বেঞ্চি থেকে দাঁড়িয়ে উঠেছিল, সুধাংশুবাবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মিনিট পাঁচ ছয় কথা বললেন ইন্সপেক্টর বাবুর সঙ্গে। আর কারো দিকে কিন্তু তিনি তাকালেন না বা অন্য কারো সঙ্গে কোনো কথা বললেন না। সুধাংশুবাবুর কাজ বোধ হয় মিটে গিয়েছিল, তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যাবার আগে রামলালের দিকে চেয়ে নমস্কার করে বললেন—আচ্ছাপণ্ডিতমশায়, চলি তবে—

—আসুন, নমস্কার। নমস্কার।

এই সময় সাব-ইন্স্পেক্টর বাবু সুধাংশুবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন—আপনি চেনেন এ পণ্ডিতমশায়কে?

—এই মাত্র আলাপ হল।

—আচ্ছা, আপনি যান। তারপর পণ্ডিতমশায়, আপনি কি মনে করে?

রামলালের মন প্রসন্ন হল সুধাংশুবাবুর ওপর। উনি না এখানে থাকলে ইন্স্পেক্টরবাবু পুছতেনই না আজ। সে বিনীতভাবে বললে—আজ্ঞে, আমার একটা দরকার আছে।

—কি বলুন না।

রামলালের লজ্জা করতে লাগলো, এতগুলি বাইরের লোক, বিশেষত রিদয়ের সামনে চাক্‌রি বজায় রাখার জন্যে কাকুতিমিনতি করতে, তার ওপর আবার বয়েস উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যে যাওয়া চাক্‌রি। এখুনি তো এতগুলি লোক জেনে যাবে যে তার বয়েস ষাট উত্তীর্ণ হয়েছে।

সে বললে—আজ্ঞে, বলবো এখন।

—আমার সময় খুব কম, একটা মিটিং আছে এস. ডি. ও.-র বাসায়। বলুন না—

—আমার বিষয় একটু বিবেচনা করে দেখুন, হুজুর—

রামলাল সেকেলে লোক, ওপরওয়ালাকে 'সার' বলতে শেখেনি।

—কি বিবেচনা করবো ?

—অন্তত আর দু'বছর আমায় এক্স্টেনশ্যন দিন দয়া করে, হুজুর।

—এই দেখুন, আমার কি স্বার্থ আছে আপনার চাক্‌রি খেয়ে! ডিপার্টমেন্টের নিয়ম অনুসারে তো আমাকে চলতে হবে, না হবে না?

—আজ্ঞে আপনি সব পারেন।

—কি পারি?

—দুটো বছর আমাকে আরও রেখে দিন হুজুর, বড় বিপদে পড়ে যাবো এ সময় অবলম্বনটা গেলে।

—কত বছরের সার্ভিস হল ?

—ছত্রিশ বছরের ওপর।

—উঃ বাবাঃ, প্রায় আমার বয়েস। আর কি পণ্ডিতমশাই, চিরজীবন চাকরি করবার ইচ্ছে আছে? আর হয় না। ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন। ভেবে দেখুন, যারা ইয়ঙ্গার মেন, তারা কি করবে? তাদের জন্যে জায়গা খালি করে দিন। কতকাল আর জায়গা জুড়ে রাখবেন? অবকাশ নিন, বিশ্রাম করুন।

—খাবো কি?

—এতদিন কি করলেন তবে?

—ছত্রিশ টাকার চাক্‌রি করে কি করতে পারতাম বলুন, হুজুর। একটা মেয়ের বিয়ে দিয়েচি, ছেলে পড়িয়েচি—

—ছেলে কি করে?

—বাড়ি থাকে।

—কি পড়াশুনো করেছে?

—আই-এ পর্যন্ত পড়েছিল, পরীক্ষা দেয়নি।

বলেন কি? আপনার ছেলে তো রত্ন মশাই এ সব অজ পাড়াগাঁয়ে। তবে আর আপনার ভাবনা কি?

—না, তবে—ইয়ে—

—কি ব্যাপার?

—সে হল একটু কবি-প্রকৃতির ছেলে। কাজকর্মের দিকে ততটা নেই। ভারি ভাবুক।

—হ্যাঁ! লেখে-টেখে নাকি?

—আজ্ঞে আপনাদের বাপমায়ের আশীর্বাদে চমৎকার পদ্য লেখে—

পুত্র-গর্বে রামলালের কণ্ঠস্বর ভরে গেল।

—বাঃ বাঃ—খুব ভালো। তা আমাকে শোনাবেন একদিন কবিতা?

—নিশ্চয় শোনাবো। আপনি হলেন অন্নদাতা, আপনাকে শোনাবো না হুজুর?

সাব্-ইন্‌স্পেক্টর বাবু এবার ঘরের বাইরে চলে গেলেন। বললেন—আমি চলি, আমার মিটিং-এর সময় হয়ে গেল—

রামলাল তাঁর সঙ্গে পথে নেমে বললে—হুজুর তা হলে আমার বিষয়টা—

দুজনেই পথচলা অবস্থায় কথাবার্তা হতে পারতো, কিন্তু রামলালের সাহসে কুলোলো না অত বড় একজন পদস্থ লোকের সঙ্গে হেঁটে বেশিদূর যেতে। চটে যেতে পারেন। চটলে কাজ পাওয়া যাবে না। রামলাল মোড়ের অশথতলাটা পর্যন্ত গিয়ে বললে—তা হলে যান হুজুর।

—আপনি অন্য সময় আসবেন—

—কোন্ সময় হুজুর?

—এই ধরুন—বেলা একটা—আচ্ছা, এক কাজ করুন। আপনি এখুনি গিয়ে বসে থাকুন আমার বাড়ি। আমি চল্লাম—

রামলাল হাতে স্বর্গ পেয়ে গেল। সে যখন সাব-ইন্‌স্‌পেক্টর বাবুর বাসায় এসে উঠলো, তখন আর সব দরবারীরা চলে গিয়েছে, রিদয় ভট্টাচার্যি নামচে বারান্দা থেকে। ওকে দেখে রিদয় বল্লে—কাজ মিটলো?

—কোথায়? কিছুই না। তোমার ?

—আমারও তথৈবচ। কেরানীর সঙ্গে দেখা করতে বল্লেন। সে তো রোজই করচি রে ভাই। কেরানী বলে আমি কি করবো? ওপর থেকে বিল আজও পাশ হয়ে না এলি কি করবে সে লোক? যাই ফিরে, আবার সোমবারে হেঁটে কোপাতি হবে তিন-তিনটি কোশ। কম গেরো! তুমি কি বসবে নাকি?

—আমায় বসতে বললেন।

—তোমার তবে পোয়াবারো। বোসো। এক যাত্রায় পৃথক ফল হল বোধ হয়। চাক্‌রিটা তাহলে থেকে গেল।

—রও ভাই, না আঁচালে বিশ্বাস নেই।

—খুচরো পয়সা আছে ভাই, দু আনা দিতি পারো? খুকিটার জন্যে মুড়কি কিনে নিয়ে যাবো।

—দাঁড়াও, দেখি আছে কিনা—

রামলাল ছেঁড়া জামার পকেট থেকে একটা দুয়ানি বার করে রিদয়ের হাতে দিলে। রিদয় ভটচার্যি বললে—চলি তবে ভাই, তোমার কাজ বোধ হয় হয়ে যাবে'খন—

ঘণ্টা দুই পরে রামলাল দেখা পেল ইন্‌স্‌পেক্টর বাবুর। তিনি বাড়ি এসে চা খেয়ে এলেন বাইরের ঘরে। রামলালকে বললেন—এখনো বসে আছেন ?

—আজ্ঞে হুজুর।

—ধৈর্য আছে আপনার।

—না থেকে উপায় কি? পেট তো বোঝে না।

—আপনার ষাট বছর বয়েস হল, এক্‌স্‌টেনশ্যন আর কি সম্ভব?

—আপনার দয়া হলি সবই সম্ভব, হুজুর।

—তার চেয়ে একটা কথা শুনুন—

—কি বলুন—

—আপনার ছেলেকে ওই চাকরিতে বাহাল করে দিতে বলেন তো দিতে পারি।

—সে করবে না হুজুর। সে হল আধুনিক ছেলে, কবিতা-টবিতা লেখে, পণ্ডিতি সে করবে না বোধহয়।

—পণ্ডিতি না, আপনার ছেলে তো আই. এ. পাশ?

—পাশ নয়, পড়েছিল। পয়সার অভাবে আর পড়াতে পারিনি হুজুর।

—বেশ। তাকে যদি সেকেন মাস্টার করে দিই মাইনর ইস্কুলের? তবে একটা কথা—

—কি?

—জি.টি. অথবা বেসিক ট্রেনিং যা হয় একটা কিছু পড়তে হবে বছরখানেক।

—হুজুর, খুব ভাল কথা। আমি তাকে বলে দেখি। সে যদি রাজি হয়, আপনার কাছে ওকে নিয়ে আসবো।

—সামনের বুধবারে আপনি নিয়ে আসবেন।

—যদি সে না করতে চায়, তবে আমার চাকরি থাকবে?

—আমি সুপারিশ করে দিতে পারি কিন্তু ওপরওয়ালা শুনবে না পণ্ডিতমশায়।

—আপনার কলম দিয়ে যা বেরুবে তা কেউ কাটতি পারবেন না—এ বিশ্বাস আমার আছে—

—আপনার সঙ্গে তর্ক করে কোনো লাভ নেই। আপনার ছেলেকে আনবেন বুধবার ?

—হুজুরের হুকুম তামিল করবো না? নিশ্চয় আনবো।

—আপনি তাকে আনবেন, সে চাকরি করে না করে, সে ভার আমার ওপর রইল।

—তাহলে আজ চলি হুজুর। বেলা গিয়েচে, পথে বড় বাঘের ভয় হয়েছে। বাঘটা রজনীপুরের পথে কাল একটা গরু মেরেচে।

—গো-বাঘা?

—সময় পেলে অনেক সময় মানুষকে আঁচড়ে কামড়ে দেয় হুজুর।

—যদি ভয় হয়, আজ রাত্রে এখানে না হয় থেকেই যান। কাল সকালে উঠে যাবেন।

—না হুজুর, কাল এখান থেকে গিয়ে ইস্কুল করতি পারবো না। জোর পায়ে হেঁটে বদ্দিপুর পর্যন্ত গেলি আর ভয় নেই। আজ বদ্দিপুরির হাট। হাটে অনেক লোকজন, গাড়ি যাতায়াত করবে সন্দের পর। নমস্কার, হুজুর। দৃষ্টি রাখবেন একটু গরীবির দিকে।

—আসুন, নমস্কার। সাবধানে যাবেন।

—যে আজ্ঞে।

রামলাল সন্ধ্যার অন্ধকারে বাড়ি রওনা হল।

পথে বাজার পড়লো। ছোট ছেলেটার জন্যে একপোয়া মুড়কি নিয়ে যেতে পারবে ভাল হয়, কিন্তু হাতে পয়সা কম। দোকানে ঢুকে দোকানীকে জিজ্ঞেস করলে কুঁচো গজা আছে?

—আছে।

—কত করে সের?

—দু'টাকা।

—মুড়কি কত করে ?

—পাঁচ সিকে।

—দাও আধপোয়া।

নিজের খিদে খুবই পেয়েছিল কিন্তু ছেলেটার জন্যে না নিয়ে গেলে মন মানে কি?

পথে অন্ধকার নেমে এল। বড় বড় মাঠের ওপর দিয়ে রাস্তা। আজকাল চারিদিকে ভয়ভিৎ, একা অন্ধকারে পথে যেতে ভয় করে। আগে আগে একজন বৃদ্ধ লোক যাচ্ছে দেখে রামলাল তাকে ধরবার জন্যে লম্বা লম্বা পা বাড়িয়ে চললো। কাছে এসে দেখলে সে লোকটা জানিপুরের রব্বানি মোড়ল, সাদা লম্বা দাড়িওয়ালা সত্তর-বাহাত্তর বছরের বৃদ্ধ ব্যক্তি, দিব্যি জোরে জোরে পা ফেলে চলেচে। ওকে দেখে বললে—বাঁড়ুজ্যে মশাই কোত্থেকে আলেন?

—একটু গিইছিলাম ইনসপেক্টর আপিসে। তুমি?

—বাজারে থেকি আসছি। একটা গরু দর করতি গিইছিলাম।

—কি দর হল ?

—দেড়শো টাকা। বড্ড দর।

—তোমাকে পেয়ে ভাল হল।

—আমারও।

—দু'জনে চলো আস্তে আস্তে হাঁটা যাক্।

—আপনি একটু বসুন। আমি নমাজটা চট্ করে পড়ে নি।

বৃদ্ধ মাঠের মধ্যে একটা গাছের তলায় নমাজ পড়তে বসলো। তারপর আবার দুজনে পথ। চলতে লাগলো। রব্বানি মোড়লও খুব খুশী হয়েছে নির্জন মাঠের মধ্যে একজন সঙ্গী পেয়ে। রামলাল বললে—কি গরু কেনবা ?

—গাই গরু।

—তোমার আছে তো?

—আমার এক গোয়াল গরু ছেল। আপনার বাপ-মার আশীর্বাদে এখনো সাতটা গরুতে দুধ দ্যায় সাড়ে তেরো সের।

—বল কি?

—তা বাঁড়ুয্যে মশাই, একটু দুধ না হলি মোরা খাবো কি বলুন! ঘি তা বাজারে নেই, সর্ষের তেল তা বাজারে নেই, চিনি তা নেই, মাছ মাংস যা দর, তাতে মোদের মত নোক কিনি খেতি পারে রোজ রোজ ? মানুষের খাদ্য-খাদক তো উঠেই গেল—

—যা বলেছ।

—আমরা যা খেয়ে গ্যালাম, এর পর যারা আসবে, তারা আর কি খাবে বলুন! এই দেশে আগে ষোল-আঠারো সের করে দুধ দেখিছি টাকায়। ঘি ছেল চোদ্দ আনা এক টাকা সের। তিন আনা করে খাঁটি সর্ষের তেল দেখেছি। এখন তার কি আছে বলুন? ক্ষেতে সর্ষে হয়, তাই এখনো খাঁটি সর্ষের তেলির মুখ একটু-আধটু দেখতে পাই—

—তোমরা আমাদের চেয়ে সুখে আছ—

—তার মানে আমাদের বাজার থেকি জিনিস কিনতি হয় না। অনেক জিনিস বাড়তি হয়—নইলি আমাদের দশাও আপনাদের মতো হত—তাই ভাবলাম দুধ বড় জিনিস। গাইগরু আরও বাড়াতি হবে, নইলে কি খেয়ে বাঁচবে ছেলেপিলে?

সামনেই জানিপুর গ্রাম দেখা যাচ্ছিল মাঠের মধ্যে। রব্বানি বললে—এইবার বাড়ুয্যে মশাই মোর গেরাম তো এসে গেল। আপনারে একলা মাঠের মধ্যি ছেড়ে দিতি মন সরচে না—মোদের বাড়ি আজ রাতে থাকবেন?

—না মোড়ল, বাড়িতে যেতেই হবে, বাড়ির লোকে ভাববে। ভয় কি? আমার একা যাওয়া অভ্যেস আছে—

—সে কথা না বাবু, দিনকাল পড়েছে খারাপ। হিন্দু মোছলমান মানবে না, এ সব অঞ্চলে খুব ভয় হয়েছে জানেন তো? মারবে মাথায় লাঠি, তারপর আপনার কাছে যা পায় আর না পায়—

—তা বটে—তবে আমার কাছে কিছু নেই তো! এই আধ পোয়া মুড়কি ছাড়া।

—ঐ যে বললাম। তারা আগে দেখবে না আপনার কাছে কি আছে না আছে। আগেই মেরে বসবে। এক কাজ করুন, কালিচরণ মুচিকে চেনেন?

—না।

—রেলের গেটম্যান ছেল, লোকটা ডাকাত, চোর সব রকম। বিলির ধারে ডান হাতে তার বাড়ি। তার কাছে গিয়ে মোর নাম করে বলুন, আপনাকে সবাইপুরির পুল পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসতি। সেখান থেকি দুধারে গাঁয়ের ভেতর দিয়ে রাস্তা। তাহলি চললাম বাঁড়ুয্যে মশাই, কিছু মনে করবেন না। একটু এগিয়ে গেলেই বিল দেখতি পাবেন।

রামলালের মনে ভয় যে একেবারে না হয়েছিল এমন নয়। সে আরও কিছু এগিয়ে গেল। মস্ত বড় মাঠে অন্ধকার ঘন হয়ে নেমেচে, মাথার ওপর আকাশে অগণ্য নক্ষত্র ফুটে উঠেচে, ফাল্গুন মাসের প্রথম—এখনো শীত আছে। খোলা মাঠের হাওয়ায় রামলালের শীত করতে লাগলো—ভুল হয়েচে একখানা গায়ের কাপড় না দিয়ে বেরুনো। শ্যামলালের গর্ভধারিণী বলেছিল চাদর নিয়ে আসতে, সে কথা শোনা উচিত ছিল। ওটা কি?

রামলালের ভূতের ভয় আছে। সে দাঁড়িয়ে গেল। ভালো করে চেয়ে চেয়ে দেখলে অন্ধকারের মধ্যে। না, ওটা একটা কি গাছ, অন্ধকারে এ রকম দেখাচ্চে। বোধহয় কুল গাছ। সে আবার পথ চলতে শুরু করলে। রশি দুই পথ বেশ একটু ভয়ে-ভয়েই গেল। বিলের ধারে এক জায়গায় আলো জ্বলচে। নিশ্চয়ই সেই কালিচরণের বাড়ি। রামলালের মনে অনেকটা সাহস হল আলোটা দেখে। চেঁচিয়ে ডাকলেও তো মানুষের সাড়া মিলবে!

বিলটা খুব বড়, অনেক পদ্মফুল ফুটে থাকে গরমকালে।এখনো ফুল ফুটতে শুরু করেনি। একটা খড়ের ছোট্ট দোচালা ঘর থেকে আলো বেরুচ্ছিল, রামলাল গিয়ে ডাকলে—ও কালিচরণ— কালিচরণ আছ?

ভেতরে থেকে গম্ভীর, মোটা গলায় কে বলে উঠলো—কিডা আছে?

—আরে আমি, কালিচরণ। বাজার থেকে জানিপুরের রব্বানি আর আমি গল্প করতি করতি এলাম। তা সে-ই বললে, কালিচরণকে একটু বলুন গিয়ে যান, সবাইপুরের পুল পর্যন্ত আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসবে। তা আমিও বললাম কালিচরণ তো আমার চেনা লোক। খুব চিনি ওকে।

কালিচরণ বাইরে এসে দাঁড়ালো, লম্বা কালো চেহারা। দেখলে মনে হয় এ লোক ডাকাতি করতে পারে বটে। রামলাল বললে—কালিচরণ, তোমার চেহারা দেখচি খারাপ হয়ে গিয়েচে—

—হ্যাঁ বাবু, জ্বর হইছিলো আষাঢ় মাসে। সেই থেকেই ভুগছিলাম।

—তুমি আমাকে একটু এগিয়ে দাও দিকি!

—হ্যাঁ চলুন, যাইগে বাবু। লাঠিটা নিয়ে আসি দাঁড়ান—

কালিচরণ লম্বা একটা লাঠি ঘাড়ে নিয়ে আগে আগে চললো। রামলাল কখননা কালিচরণকে দেখেনি, তার নামও শোনেনি। অথচ তার সঙ্গে এমন ধরনের কথা বলতে হচ্ছিল তখন, যেন সে কতদিনের পরিচিত।

কালিচরণ বললে—হামার বাবাকে আপনি জানতেন তো? বড় ভাল লোক ছিলো—উ রেলগাড়িতে কেটে মরলো মাদলার পুল বানানোর সময়—

—খুব জানি। অমন লোক আর হয় না। কি নাম ছিল যেন—

—গঙ্গারাম—

—গঙ্গারাম, গঙ্গারাম।

—এখনো গঙ্গারামের নাম শুনলে লোকের চোখের পানি গিরে—

—এই তো সেদিনও ফণীকাকার সঙ্গে গঙ্গারামের কথা হচ্ছিল—

—আচ্ছা বাবু, হামাকে ডাকাত বলে চালান দিয়ে দিল শালার লোগ! হামি ডাকাত আছে বাবু?

—আরে রাম রাম—তোমার নাম শুনলে সবাই এদেশে খুশী হয়। এখনো বাড়ির মেয়েরা তোমার কথা বলে।

—তা বলবে না? হামি ছেলের মতো আছে সোকলের।

—আমরা তো তাই জানি।

কালিচরণ খুব খুশী হয়ে সবাইপুরের পুল পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল রামলালকে। বাকি পথটুকু সন্ধ্যার অন্ধকারে অতিক্রম করে রামলাল নিজের বাড়ি পৌঁছে গেল আধঘণ্টার মধ্যে। রামলালের স্ত্রী অন্নপূর্ণা উঠোনের শিউলিতলায় বসে হারিকেন লণ্ঠনের আলোতে কি করছিল, পায়ের শব্দ শুনে বললে—কে? কে?

—আমি।তুমি ওখানে কি করচো?

—মাছ দিয়ে গেল বিধুর মা। তাই বসে বসে বাছচি—

—কি মাছ?

—পুঁটি। তোমার কাজের কি হল?

—কিছুই না। বললে, শ্যামকে নিয়ে যেতে। তাকে চাক্‌রি দেবার ইচ্ছে আছে।

—শ্যাম তোমার মত পণ্ডিতি করবে? তাই আর করেচে! সে মিথ্যে নিয়ে যাবে কেন? ওর মত হবে না।

—একবার বলে দেখি! কোথায় গিয়েচে?

—পতিতপাবনের বাড়ি সত্যনারাণের পুঁথি পড়বার জন্যে ডেকে নিয়ে গিয়েচে—

স্বামী-স্ত্রীতে মিলে পরামর্শ হল এর পরে। রামলালেরও ইচ্ছে নয় ছেলেটা চিরজীবন ইস্কুলে মাস্টারি করবে এই পাড়াগাঁয়ে। ওরা জানে তাদের ছেলে গ্রামের সেরা ছেলে। অমন পদ্য লিখবার ক্ষমতা এ গাঁয়ের কোন ছেলের আছে? সবাই ওকে ডেকে নিয়ে যায় বিয়ের সভায়, সত্যনারাণের পুঁথি পড়তে। এমন সুন্দর পুঁথি পড়তে পারে, দু'দণ্ড বসে শুনবার মতো। নিজেদের ছেলে বলে বলচে না রামলাল, যেমন চেহারা, তেমনি গুণ। শ্যামলালের বাবা বলে সত্যি মনে মনে এক এক সময় গর্ব হয় রামলালের।

অনেক রাত্রে পুঁথি পড়ে শ্যামলাল বাড়ি ফিরলো। হাতে তার বড় কাঁসার জামবাটিতে সত্যনারাণের কাঁচা প্রসাদ, অন্য হাতে কলা-মূলো পাটালি। এসেই বললে—বাবা এয়েচ?

রামলাল তামাক খেতে খেতে বাইরে এসে বললে—এসেচি অনেকক্ষণ। তুই কোথায় ছিলি?

—দেখতেই পাচ্চ। সত্যনারাণের সিন্নি ছিল গুরুদাসদের বাড়ি।

—খাওয়ালে তোকে?

—হ্যাঁ, গুরুদাস আবার খাওয়াবে! জানো না কেমন ওরা? ওই যেমন সবাইকে প্রসাদ খাওয়ায়, তেমনি আমাকেও খাওয়ালে।

—সারা দিন উপোস করে ছিলি ?

—নাঃ—পুঁথি পড়বো তার আবার উপোস কি? ভারি বিয়ে তার দু'পায়ে আলতা!

—যা হাত-পা ধুয়ে খেয়ে নিগে যা।

—তোমার কাজের কি হল বাবা?

—তুই খেয়ে আয়, বলচি।

শ্যামলাল আহারাদির পরে বাবার কাছে এসে বসলো। রামলাল আজকের দিনের সব খুঁটিনাটি ঘটনা বললে। শ্যামলাল শুনে বললে—আমায় কবে দেখা করতে বলেচেন ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু?

—তুই কি মাস্টারি করবি?

—তুমি বললে করবো না কেন? তোমার কি মত?

—আমার মত তা নয়। আমি আমার নিজের জীবনটা নষ্ট করেছি, আবার. তোকে তা করতে দেবো না।

—তুমি তো বলে খালাস। সংসার চলবে কি করে?

—সে আমি বুঝবো।

—তোমার কথা শুনলে আমার রাগে গা জ্বলে যায় বাবা। তোমার বয়েস হল বাষট্টি বছর। তুমি এখন আর কি করবে? আমার ওপর সব ছেড়ে দাও। আমি বুঝে নিচ্চি—

—না। যা বলচি, তাই শোন। আমার মতে তুই চলবি না তোর মতে আমি চলবো?

—তবে ইন্‌স্‌পেক্টর বাবুর কাছে বলে এলে কেন যে আমাকে নিয়ে তুমি সেখানে যাবে?

—অত বড় লোক একজন, মুখের ওপর না বলতি পারি?

—যখন বলেচ তখন নিয়ে যেতে হবে, সে আমি শুনবো না। তুমিই বাবা আমায় এমন করে রেখেচ। আমায় কোথাও যেতে দেবে না, কোনো কাজ করতে দেবে না—তবে আমি কি করে মানুষ হবো বলো! আমায় যেতে দাও বাইরে।

—আমি এক মতলব ঠাউরেছি। চল, পশ্চিমে তোর সেজমামা ডাক্তারি করে যেখানে, পাহাড়-জঙ্গলের জায়গা, সেখানে তুই আর আমি চলে যাই। সে দেশ ভারি ভালো। তোরবড্ড ভাল লাগবে। আমি সেখানে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারি করবো। দুজনে মিলে যা হয় কিছু করা যাবে। তাই চল্। আজ পথে আসতে আসতে ওই কথাই ভাবছিলাম।

॥২॥

যাবার দিন ঠিক হয়ে গেল। রামলাল খুব সেকেলে নয়, বাড়ি থেকে বেরুবার সময় সে পাঁজিপুঁথি মানে না। রামলালের স্ত্রী অন্নপূর্ণা আত্মীয়ের বাসায় যেতে হলে যে সব জিনিস হাতে করে যেতে হয়, সেই সব গোছাতে লাগলেন। অন্নপূর্ণার আপন ভাই কেউ নেই—খুড়তুতো জ্যাঠতুতা সম্পর্কের ভাই হলেন শরৎকালী গাঙ্গুলী। সেখানে এদের কেউ কখনো যায়নি—তবে শরৎকালী গাঙ্গুলী এই বোনটিকে খুব ভালবাসেন, অবস্থা তত ভাল নয় বলে ভগ্নীপতিকে মাঝে মাঝে কিছু সাহায্যও করেন।

শ্যামলাল আজ দু'দিন ধরে স্কুলের ম্যাপ নিয়ে এসে নানা দাগ দিচ্ছে ও নোটখাতায় কি সব লিখে নিচ্ছে। খুব খুশী হয়েছে সে, কখনো জীবনে কোথাও বেরোয়নি—আজ হঠাৎ এতদূর চলে যাবে!

শ্যামলালের বন্ধু ওপাড়ার রতন হালদার এসে বললে—সে কি রে! তোরা নাকি চলে যাবি শুনলাম? কতদূর যাবি?

শ্যামলাল ম্যাপ দেখে পথঘাট ঠিক করচে আজ কদিন। বললে—চল, নদীর ধারে গিয়ে বসি—

—আগে বল কতদূরে যাবি?

—এক কথায় বললে হবে না, সেইজন্যেই তো নদীর ধারে গিয়ে বসে বলবো।

—অত ভণিতার দরকার কি বাপু? জায়গাটার নাম বলে ফেলো শুনি!

—নাম বললে তুই কি বুঝবি? জায়গাটার নাম ধুরুয়াডিহি, উড়িষ্যার গাংপুর স্টেট আছে, তারই মধ্যে। বড় পাহাড়-জঙ্গলের জায়গা বলে শুনেচি। স্টেশনের নামও ধুরুয়াডিহি।

—কোন্ দিকে?

—বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের স্টেশন। হাওড়া থেকে উঠতে হবে। আমি সব ঠিক করে রেখেচি ম্যাপ দেখে। চল তোকে সব বোঝাবো।

—অতদূর যাবি কেন? এদেশে ভাত নেই? ইস্কুলে মাস্টারি কর না?

—আমার কোনো অনিচ্ছা নেই। কিন্তু বাবার মত নেই।

—কেন?

—তিনি বলেন, ঐ করে আমার নিজের জীবনটা নষ্ট করেচি, তোমার জীবনটা আর নষ্ট করতে চাইনে।

—তাঁর ইচ্ছে? নষ্ট আর কি হল তাঁর জীবন! বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে টাকায় দশ সের বারো সের খাঁটি দুধ খেয়ে পাঁচ সিকে সের গাওয়া ঘি খেয়ে দিব্যি কাটিয়ে গেলেন। হয়েচে তোমার আমার বিপদ। আমরা টাকায় পাঁচ পোয়া দুধ কিনবো, তাও জল। ঘি বলে পদার্থ নেই বাজারে। তেল নেই। মাছ মাংস আগুন দর। যে দেশে যাচ্ছ, সে দেশে জিনিস-পত্র সস্তা বলতে পারো?

—তা বলে মনে হয় না। ভারতবর্ষের কোথাও আর এখন জিনিস-পত্তর সস্তা থাকবে ভেবেচ? তবে উনিশ আর বিশ।

—তবে অতদূরে কেন?

—বাবা বলেন, আমার জন্যেই তিনি অতদূরে যাচ্ছেন। আমার জন্যে একটা কিছু করে দিতে চান সেখানে।

—তোর যাবার ইচ্ছে আছে?

—বাবা যা বলেন, যাতে উনি সন্তুষ্ট হন, সে-ই এখন আমার ইচ্ছে। এখন বুড়ো হয়ে পড়েচন তো, কেবল মনে ভাবেন, আমার একটা কিছু করে দিয়ে যাবেন। যেখানে যাচ্ছি, সেখানে আমার এক মামা ডাক্তারি করেন। আগে ছিলেন তিনি স্টেশনমাস্টার, চাকুরি ছেড়ে দিয়ে এখন ডাক্তারি করেন ওখানেই। বাবা তো হোমিওপ্যাথিক ওষুধ নিয়ে অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করেচেন, তাই সেখানে গিয়ে বসতে চান। আসল উদ্দেশ্য আমার একটা কিছু সুবিধে করে দেওয়া।

—এক বনে দুই বাঘ চলবে! তোমার মামা ডাক্তার, তোমার বাবাকে নিয়ে গিয়ে নিজের পসারের ভাগ দেবেন!

—তা ভাই আমি বলতে পারি নে। সে বুঝবেন ওঁরা দুজন। তবে শরৎকালী মামা মাকে বড় ভালবাসেন এটা জানি। আর তিনিও বুড়ো হয়েচেন, বিদেশে একা বহুদিন আছেন, আপনার লোকজন কাছে রাখতে চান, এও একটা কারণ হতে পারে বোধ হয়।

দুই বন্ধু নদীর ধারে বেড়াতে গিয়ে অনেকক্ষণ বসলো। কার্তিক মাসের বৈকালে নোনা গাঙের খালে জোয়ার এসেচে-—নাটাকাঁটার বন ডুবে গিয়েচে, বেতবনের ডাটা ঝুঁকে আছে জলের ওপর। একটা হরিয়াল পাখি উড়ে এসে বসলো ডুমুরের ডালে। রতন বললে—আজ ভূতিদের বাড়ি সত্যনারাণের সিন্নি—সেখানে যাবি সন্দের পর তো?

—ও তো আমার বাঁধা কাজ। যেখানেই সত্যনারায়ণের সিন্নি হবে, আমাকে পুঁথি পড়তে হবেই।

—বেশ লাগে, না?

—বেশ জ্যোৎস্না ওঠে, নারকোল পাতা চিক্ চিক্ করে, শাঁক বাজে, মেয়েরা উলু দেয়—

—থাক ওসব কবিত্ব। আমি সেকথা বলিনি—ভূতিদের বাড়ি পুঁথি পড়তে ভাল লাগে,না?

—যাঃ, ভূতিদের বাড়ি কেন, সকলের বাড়িই ভাল লাগে—

—মিথ্যে কথা বলিসনে। তোকে আর ঢেকে-রেখে কথা বলতে হবে না। ভূতি কি বলেচে তোর যাবার কথা শুনে? সত্যি কথা বল!

—মন খারাপ করেচে।

—কবে তোর সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

—রোজই হয়। চোখের জল ফেলেচে কাল।

—ফেললেই বা কি! তোমার বাবা ভূতির সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবেন না।

—না দিলে আমার জোর নেই তো। তবে বাবা এখনো কিছু জানেন না।

—দ্যাখো, আমিও যাবো সত্যনারাণের সিন্নিতে।

কিছুক্ষণ পরে শ্যামলাল তার বন্ধুর সঙ্গে গ্রামের ৺জীবনকৃষ্ণ চক্রবর্তীর বাড়ি সত্যনারাণের পুঁথি পড়তে গেল। চক্রবর্তী মশায়ের ছোট ভাই অঘোর চক্রবর্তী ওদের দেখে বললেন—এই যে! ওই ঘরে যাও। পুজোর জায়গা হয়েচে। হাত পা ধুয়ে নাও। এখনো পুরুতমশায় আসেনি—এসো বোসো রতন, ওই বড় শতরঞ্জিখানা, বাইরের রোয়াকে পেতে নাও তো বাবা—

রতন বুঝলে তাকে ঘরের মধ্যে যেতে বারণ করা হল। শ্যামলাল ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলে ও অপ্রসন্ন মুখে অঘোর চক্রবর্তীর কথামত কোণ থেকে শতরঞ্জিখানা এনে রোয়াকে পেতে নিয়ে তার ওপরে বসতে যাচ্ছে, এমন সময় একটি গৌরাঙ্গী সুন্দরী ষোল-সতেরো বছরের মেয়ে এসে বললে—রতনদা, একবার পুরুতকাকার ওখানে যাও তো, এখনো কেন এলেন না—

—পুজোর যোগাড় হয়ে গিয়েচে?

—কোন্ কালে! তুমি যাও, একটু তাড়াতাড়ি আসতে বলগে—

—তুই বুঝি উপোস করেছিস, ভূতি?

—আহা, আমি কেন উপোস করতে যাবো? মা করেচে।

ভূতি কি একটা প্রশ্ন ওকে করতে গিয়েও যেন করতে পারলে না।

রতন চলে গেল। ভূতি ঘরের মধ্যে ঢুকতে গিয়ে সামনেই কুশাসনে উপবিষ্ট শ্যামলালকে দেখে অবাক হয়ে বললে—একি? ভূত নাকি?

শ্যামলাল ঘরের চারিদিকে একবার চট করে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বললে—বাঃবাঃ, ভূত তো বটেই! তুই ব্যাকরণ পড়েচিস তো, ভূতের পেত্নী কি হয় বল্ তো?

—যাও—সত্যি বল না কখন এলে?

—তোর চোখের সামনে দিয়ে তো এলাম, টের পাসনি?

—মাইরি না। মিথ্যে বলচি? আমি রতনদাকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম তুমি কেন আসতে দেরি করচো আজ—জিবের আগায় এসে গিয়েছিল, কিন্তু আটকে গেল।

—আটকালো কেন ?

ভূতি ঝংকার দিয়ে বললে—জানি নে। অত খবর দিতে পারবো না। আহা নেকু!

—মারবো তোর মুখে ঝাঁটা—

—মারো না দেখি—

—আচ্ছা মিথ্যে মিথ্যে ঝগড়া করে মরচিস কেন সন্দেবেলা? যা, পুজোর যোগাড় করে দিগে যা। খুড়ীমাকে ডাক দে—

—আচ্ছা শ্যামদা, তুমি সত্যি চলে যাচ্চ সেই কোথায়!

—যাচ্ছি তো।

—কেন যাচ্চ অতদূরে?

—পেটের ধান্দায়—

—এখানে পেট চলে না? জ্যাঠামশায় এখানে কি করে চালাচ্ছেন?

—বাবা বলেন, এখানে রেখে তোমার জীবনটা আমি নষ্ট করতে চাইনে। বাবার যা মত, তাই তো আমাকে করতে হবে।

এই সময়ে একটি প্রৌঢ়াকে হরিনামের ঝুলি হাতে বাইরের বারান্দা দিয়ে ঘরের দিকে আসতে দেখে ভূতি দৌড়ে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। প্রৌঢ়া ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে দেখে বললেন—বসে কে ওখানে?

শ্যামলাল বললে—আমি, পিসিমা।

—আর কেউ নেই? পুরুত কোথায় ?

—আসেননি এখনো। আসুন বসুন পিসিমা, অনেকক্ষণ থেকে একা বসে ভাল লাগচে না।

—না, আমি বাইরে বসে ততক্ষণ একটু জপ সেরে নি।

প্রৌঢ়াকে এ গাঁয়ের সকলে ভয় করে চলে, বিশেষত প্রণয়ভীরু তরুণ-তরুণীরা। কারণ রায়পিসি হলেন এ গাঁয়ের গেজেট। এর কথা ওর কানে সাতখানা করে লাগানো, খুঁজে খুঁজে লোকের দোষ বের করা, কুৎসা রটনা—বিশেষ করে কুমারী মেয়েদের বিয়েতে ভাংচি দেওয়া প্রভৃতি কাজে রায়পিসির জুড়ি মেলা ভার। পরের মন্দ দেখে এত খুশী বোধ হয় আর কেউ হয় না এ গাঁয়ে। এ হেন রায়পিসি ঘরে না ঢুকে বাইরে বসাতে শ্যামলাল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে।

পুরুতঠাকুর কিছুক্ষণের মধ্যেই এলেন। শ্যামলাল পূজা-অন্তে পুঁথি পাঠ করলে। দিব্যি জ্যোৎস্না রাত। প্রসাদের বাটি বিলির ভার শ্যামলাল নিজে নিয়েচে, ইচ্ছে করে কিছুক্ষণ দেরি করবার জন্যে। এই দঙ্গল বজায় থাকতে ভূতির সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা কোথায় ? আপদ বিদেয় হয়েও কি হয় ? একদল যায় তো আর একদল আসে!

কাজ মিটতে রাত দশটা বেজে গেল। ভূতির মা এসে বললেন—বাবা, তুমি একটু জল না খেয়ে যেও না যেন। অনেক খাটাখাটুনি করলে। এসো রান্নাঘরের পিঁড়েতে—

শ্যামলাল গিয়ে দেখলে ভূতি সেখানে একখানা বড় আঙট কলাপাতা ছিঁড়ে ওর জন্যেই বোধ হয় জায়গা করচে। রান্নাঘরের মধ্যে কিন্তু অনেক লোক—তবে তারা নিজেদের মধ্যে গল্পগুজবে ব্যস্ত। রান্নাঘরের পিঁড়ের একপাশে ছোট্ট ডোলে ধান তোলা আছে, ডোলের তলায় আট-দশটা পাকা মিঠে কুমড়ো। এক আঁটি শোলা ডোলের চালে তোলা। ভূতির খুড়ীমা একবার বাইরে এসে শ্যামলালকে দেখে বললেন—এসো বাবা, বোসো। ভূতি পাতা ধুয়ে দিইচিস তো? আগে মুগের ডাল ভিজে আর ফলমূল নিয়ে আয় ওঘর থেকে—যা—

শ্যামলাল খেতে বসবার কিছুক্ষণ পরেই খুড়ীমা অন্যদিকে কোথায় কাজে গেলেন। ভূতি একখানা বগিথালা হাতে শ্যামলালের পাতের সামনে এসে যখন দাঁড়ালো তখন রান্নাঘরের পিঁড়ে জনশূন্য।

শ্যামলাল মুখ উঁচু করে চেয়ে বললে—ওতে কি?

—ডাল ভিজে। দেবো?

—দে।

—আর কি দেবো? তুমি তো কবি মানুষ, আদ্ধেক জিনিস মুখে রোচে না।

—আর যা দিস, শশা আর শাঁকআলু দিস্ না, দুচক্ষে দেখতে পারিনে।

—তবে দাঁড়াও, লুচি আনি—

—শোন শোন, লুচি থাক। দে যা আছে থালাতে তাই দে।

—হঠাৎ এত ভক্তি ফলমূলের ওপর ?

—ওরে দূর্! এখুনি কে এসে পড়বে, দুটো কথা হবে না। বুঝিসনে কেন?

—না না, তোমার খাওয়া হবে না। দাঁড়াও।

—এই ভূতি! যেও না বলচি, খবরদার!

ভূতি হেসে ফেললে। থালা নামিয়ে সামনে বসে পড়ে নিম্নস্বরে বললে—রায়পিসি কিন্তু এখনো যায়নি। রান্নাঘরের মধ্যে বসে ছোট খুড়ীমার সঙ্গে কথা বলচে—

—বলিস কি!

—সত্যি বলচি। তা হোক, তুমি বসে খাও, অত ভয় করবার কি আছে? আমি লুচি আনি—

ভূতি থালায় করে গরম লুচি এনে খান-দশ-বারো শ্যামলালের পাতে দিয়ে বললে— রায়পিসি খেতে বসেচে ওদিকের চালায়—

শ্যামলাল বললে—বাঁচা গেল! খাওয়া ফেলে ও বুড়ি আর উঠচে না। তারপর শোন, আমার কথা মনে থাকবে?

ভূতি মুখভঙ্গি করে বললে—আহা ? তা কি আর থাকবে?

—চিঠি দিবি?

—কি করে দেবো? তা বুঝি দেওয়া যায়?

—আমি যদি দিই?

—না, ওসব করতে যেও না। গাঁ জানো তো? এমনি তো কত রকম কথা উঠিয়েচে—

—আমার কথা মনে থাকবে তো?

—আহা কি কথার ছিরি! কেউ বুঝি আবার কারো কথা ভোলে ?

—কেউ ভোলে কি না সে কথার দরকার কি? তুই ভুলবি নে তো?

—জানি নে। খেয়ে নাও ভাল করে। লুচি ফেললে চলবে না।

শ্যামলালের কবিপ্রাণ যেমনটা আশা করেছিল তেমন ধরনের কোনোমিষ্টি মোলায়েম নাটুকে ব্যাপার বা কথাবার্তা কিছু ঘটলো না। গল্পের বই-টইয়ে যেমন ধারাটি পড়া যায়। তেমন হল কই?

খেয়ে চলে আসার সময় ভূতি ওর হাতে একটা সাজা পান দিয়ে কেবল হেসে ওর মুখের দিকে চাইলে। ছোট্ট করে বললে—এসো শ্যামদা—

—হুঁ।

—কবে যাচ্চ?

—পরশু সকালে।

—আসবে কবে?

—তা আর কি জানি!

—শীগগির এসো—

ব্যাস্, এই পর্যন্ত শেষ। শ্যামলাল অপ্রসন্ন মনে বাড়ির দিকে রওনা হল। কয়েক পা আসতে না আসতে পেছন থেকে রায়পিসি বলে উঠলেন—ও শ্যামা, একটু দাঁড়িয়ে যাও বাবা—আমায় নিয়ে যাও—

ভালো মুশকিল! শ্যামলাল যা পছন্দ করে না তাই। বাধ্য হয়ে দাঁড়াতেই হল।

রায়পিসি এগিয়ে এসে ওর পাশে পাশে চলতে লাগলেন। শ্যামলাল বললে—আপনার বাড়ি পর্যন্ত দিয়ে আসবো পিসিমা ?

—না বাবা, এই ঠাকুরবাড়ির পুকুর পর্যন্ত এগিয়ে দিলিই হবে। আজকাল আবার যা বাঘের ভয় হয়েচে—

—চলুন।

কিন্তু রায়পিসি কিছুক্ষণ পরেই প্রকাশ করলেন যে পরের কথা ছাড়া তিনি থাকেন না। প্রথমে তুললেন শ্যামলালের বাবার কথা।

—হ্যাঁরে শ্যামা, তোর বাবার চাকরিটা গেল কেন? আহা কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে এই বয়সে—দাঁড়াবার থল নেই! অতি কষ্টে চালাচ্ছিলেন দাদা—

শ্যামলাল অত্যন্ত চটে গেল। তার বাবাকে নিচু করে দিয়ে যে কোন কথাই হোক না কেন, তার ভাল লাগে না। তার বাবা গরিব, একথাও তার সহ্য হয় না। সে বললে—তা আর কি হবে বলুন!

—চাক্‌রিটা গেল কেন? আচ্ছা দাদা তো অনেককাল থেকেই পণ্ডিতি করছিলেন, ভালই পড়াতেন শোনাতেন—

অর্থাৎ চাক্‌রি থেকে কোন্ দোষে রামলাল বরখাস্ত হয়েছেন সেই সংবাদটাই রায় পিসি জেনে নিতে চান এবং রায়পিসির ধারণা রামলাল অকৃতকার্যতার জন্যেই চাক্‌রিটা হারিয়েছেন।

শ্যামলাল বললে—ষাট বছর বয়স হলে আর চাক্‌রিতে রাখা নিয়ম নেই গবর্নমেন্টের।

—দাদার বয়েস ষাট বছর হয়েছে নাকি?

—তার দু'এক বছর বেশি ছাড়া কম নয়।

রায়পিসি কপট সহানুভূতির সুরে বললেন—আহা কি বিপদেই পড়ে গেলেন দাদা এই বয়সে—এই বাজারে এখন সংসার চালানোই যে দায়! দুবেলা ভাত জোটাই যে মুশকিল হয়ে পড়লো!

অর্থাৎ কোনো রকমে শ্যামলালের মুখ দিয়ে যদি বেরোয়, তাই তো পিসি, সত্যিই বড়কষ্ট হয়েছে সংসারের—তবে রায়পিসি সেই একখানা কথা সতেরোখানা করে পাড়ায় পাড়ায় রটনা করে বেড়াবেন।

—আহা, আর কি বলবো, কি কষ্টেই পড়েছে রামু পণ্ডিত! কোন বেলা হাঁড়ি চড়ে, কোন বেলা চড়ে না। কাল ছেলেটা কত দুঃখু করতে লাগল আমার কাছে, মধ্যে একদিন খাওয়াই হয় নি শুনলাম—তা হবে না? ধাড়ি অত বড় ছেলেটা কোন কাজ করে না, শুধু বসে বসে গিলবে—আর স্বভাব-চরিত্তির যা, সে আর—

এই পর্যন্ত বলে রায়পিসি হঠাৎ সুর নিচু করে ফেললেন গলার, তারপর এদিক-ওদিক চেয়ে বললেন—এ মিথ্যে কথা নয়, নিজের চোখে দেখা—ওই নিবারণ চক্কত্তির মেয়েটার সঙ্গে—সে-সব কেলেঙ্কারির কথা বাপু আর না বলাই ভাল—নিজের চোখে যদি না দেখতাম—যাক গে, ওসব পরের কথায় থাকিও নে, সে-সব কথার দরকারও নেই—

কিন্তু শ্যামলাল টোপ গিলল না, কারণ তার বাবাকে ছোট করে দেওয়াতে সে গোড়া থেকেই চটে গিয়েচে। শ্যামলালকে না চিনে রায়পিসি চালে ভুল করে ফেলেচেন।

সে বললে—বাবা হোমিওপ্যাথিক জানেন, তাই করবেন।

—সে-সব বাবা এদেশে চলবে না। ও হুমানপ্যাথির জলে এদেশের লোকের বিশ্বাস তো ভারি!

—না, এদেশে নয়।

—ও, তবে কোথায় ?

—আপনি কি বুঝতে পারবেন পিসি? সে অনেকদূর, পশ্চিমে।

—পশ্চিমে! গয়া কাশী নাকি?

—ওদিকে না। আপনি বুঝতে পারবেন না। সেখানে আমার এক মামা থাকেন, তাঁরই কাছে। আমিও যাবো বাবার সঙ্গে—

রায়পিসি যেন কিঞ্চিৎ দমে গেলেন। খানিক দূর পর্যন্ত কোন কথা না বলেই পাশাপাশি হেঁটে চললেন। পরে হঠাৎ শ্যামলালের দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—হাঁরে, বলি নিবারণের মেয়েটার সঙ্গে কি তোর বিয়ের কোনো কথাবার্তা চলচে?

প্রশ্নের আকস্মিকতায় শ্যামলাল একটু চমকে গেলেও তখুনি নিজেকে সামলে নিয়ে বললে কে? ভূতি? রামোঃ! আমার আর কি খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই? তাছাড়া বিয়ে করে এখন আমি খেতে দেবো কি?

—তাহলে তোদের বিয়ের কথাবার্তা কিছু হয়নি? সর্বদা মেলামেশা করিস কিনা তাই বলচি—

—রামোঃ! অমন কানে—পুঁজপড়া মেয়ে আমার বিয়ে করবার দায় পড়ে গিয়েচে। যেমন কালো, তেমনি হুদমো—তেমনি ঝগড়াটে—

ইচ্ছে করেই শ্যামলাল ভূতির বিরুদ্ধে এই মিথ্যা বিশেষণগুলি প্রয়োগ করলে—এ ছাড়া আর কোন কৌশল হঠাৎ তার মাথায় এলো না। ওর গলার সুরে ভূতির প্রতি যদি এতটুকু অনুরাগ ধরা পড়ে যায়—এই হল শ্যামলালের আসল ভয়। রায়পিসিও রটনা করে বেড়াবার মস্ত বড় একটা বিষয় পাবে তা হলে। না, রায়পিসি যেন বেশ খানিকটা দমেই গেলেন। মনে মনে যেটা চাচ্ছিলেন তিনি, সেটা হল না। কথা দিয়ে কথা বের করবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন, এতটুকু পেলেও কাজ হত যে!

শ্যামলাল তাকে পুকুরের পাড় পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে বললে—তা হলে যাই, পিসিমা। দাঁড়ান, একটু পায়ের ধুলো দিন, দেশ থেকে চলে যাচ্চি, আপনাদের আশীর্বাদই ভরসা।

—এসো বাবা এসো, ধনেপুত্রে লক্ষ্মীশ্বর হও। বেঁচে থাকো। দাঁড়া—কাছে আয়—

রায়পিসি ওর চিবুকে হাত দিয়ে চুমু খেলেন।

॥ ৩॥

রায়পিসিকে পৌঁছে দিয়ে শ্যামলাল জ্যোৎস্নার আলো-জাল-বোনা পথ দিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হল। ওর কেবলই মনে হচ্ছিল আর কদিন পরেই এমন সোনার দেশ ছেড়ে কোথায় কতদূরে যাবে সে! সেখানে এমনধারা কি গুলঞ্চলতা দোলে ডালে ডালে, এমন লাল কল্‌মী-শেওলার সাদা ফুল ফোটে বিল বাঁওড়ের জলে, এমন কেলেকোড়া ফুলে সুগন্ধ বার হয়, এমন পাখি ডাকে বনের ধারে?

কি জানি সে কেমন দেশ। তবু যেতে হবে, কারণ বাবার ইচ্ছে। চিরকাল পণ্ডিতি করে সংসার চালিয়ে এসেছেন, আজ কোনো সম্বল নেই, তাঁর এ বুড়ো বয়েসে। বাবার অন্নে তার এই চব্বিশ বছরের জীবনটা কবিত্ব করে বেশ নিরুদ্বেগেই কেটেচে, আজ তাকে দাঁড়াতেই হবে বুড়ো বাবাকে সাহায্য করবার জন্যে। উনি যা বলেন, যেখানে নিয়ে যান।

বাড়ি ফিরবার পথে গোষ্ঠ ঘোষের চণ্ডীমণ্ডপে কি একটা নাটকের রিহার্সাল দিচ্ছে ছেলেছোক্‌রারা। ওর বড় ইচ্ছে হল একবার বসে একটুখানি যোগ দিয়ে যায় এদের আড্ডায়। এই সব করেই এত বড় হয়ে উঠেছে এই গ্রামে। এ ছাড়া জীবন কল্পনা করতেই পারে না। তার বাবা এতদিন পর্যন্ত তাকে বালকের মত পালন করে এসেছে, কোনো শক্ত কাজে লাগায়নি, জীবন-সংগ্রামের ক্ষেত্রে নামতে দেয়নি। সাহায্য করেচে ওর মধ্যে একটি শান্ত, নিস্পৃহ, সরল, নিরুদ্বিগ্ন কবিমন গড়ে উঠবার। অতি ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে সে কবিমন এই গ্রামের আবহাওয়ায়। আজ মূল শেকড়সুদ্ধ সেই কচি গাছটিকে উপড়ে নিয়ে গিয়ে পোঁতা হবে কোন্ সুদূর অজানা দেশের রুক্ষ, নীরস, পাথুরে দেশের কঙ্করময় মৃত্তিকায়!

গোষ্ঠ ওকে দেখে বললে—আরে এসো এসো শ্যামদা, আজ কি পথ ভুলে এলেন নাকি এদিকি?

—কি থিয়েটার হবে এবার তোমাদের ক্লাবের? দেখতে এলাম!

—শুধু এলি হবে না, আপনার রোজ এসে শেখাতি হবে। কানাইকে একটু মানুষ করে দ্যান। কথাবার্তা ওর মোটে শুরুদ্ধ উশ্চারণ হতি চায় না—আসুন বসুন—

শ্যামলালকে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে গোষ্ঠ ঘোষ খেজুরের পাতায় বোনা চ্যাটার ওপর বসালে। হাতের লেখা একখানা খাতা এগিয়ে দিয়ে বললে—শিবাজীর পার্ট একটুখানি দেখিয়ে দিয়ে যান আমারে—শুধু আপনি একটুখানি পড়ে যান—

কানাই জেলে একটা বিড়ি ধরিয়ে এনে খাতির করে বললে—খান—

গোষ্ঠ বললে—ও কি! উনি ওসব খান-টান না। বামুনপাড়ার বওয়াটে ছোঁড়াদের মত নন উনি। লেখাপড়া নিয়েই থাকেন।

শ্যামলালকে এরা সত্যি অন্য চোখে দেখে। ও যে অন্য ধরনের মানুষ, তা সবাই জানে। শ্যামলাল অনেকক্ষণ বসে বসে শিবাজীর পার্ট শেখালে গোষ্ঠকে। সবাই এগিয়ে এসে মন দিয়ে শুনতে লাগলো।

ওপাড়ার নন্দ সাঁপুই বললে—নাঃ, এমন শুরুদ্ধু উশ্চারণ না হলি কি আর পার্ট করা চলে ? কি চমৎকার পড়া! আর একটু পড়ে দ্যান, যেন মধু!

গোষ্ঠ বললে—আরে তা না হলি ওরে এত খাতির করবো কেন? এমন ছেলে এ গাঁয়ে কডা আছে? শ্যামদা, 'দুই পুরুষ' খুলবো যদি আপনি ভরসা দ্যান—'দুই পুরুষ' আর 'পথের শেষে'—

—আমার দ্বারা আর হবে না। আমি চলে যাচ্ছি।

প্রায় সকলেই সমস্বরে বলে উঠলো কোথায়? কোথায়?

—পশ্চিমে।

—কেন?

শ্যামলালকে আবার তার যাওয়ার উদ্দেশ্য বিস্তৃতভাবে বুঝিয়ে দিতে হল। নানা রকম প্রশ্ন নানা দিক থেকে বর্ষিত হতে লাগলো। এরা সবাই ঘরবোলা নিতান্ত সরল গেঁয়োলোক, অতদূর তো দূরের কথা, কলকাতাতেই অনেকে এখনো যায়নি। শ্যামলালও সে দেশের কথা বিশেষ কিছু জানে না।স্কুলের ম্যাপের সাহায্যে যতটা সে জানতে পেরেচে, তাই বুঝিয়ে বললে। অনেক অবাক হয়ে গেল।

গোষ্ঠ বললে—আমাদের নামিয়ে দিয়ে যান শ্যামদা। আপনি থাকলি মস্ত ভরসা।

—সে হয় না। তোমাদের নামতে এখনো একমাসের উপর দেরি। আমাকে দু-চার দিনের মধ্যে যেতে হবে। আজ এখন আসি।

কানাই বললে—চা খাবেন বসুন। আমাদের চা চড়েচে, গুড়ির চা কিন্তু খেতে হবে।

—না না, এত রাতে আমার জন্যে আবার চা কেন?

—আপনার একার জন্যি নয়, সবাই খাবে।

শ্যামলাল প্রত্যাখ্যান করতে পারলো না। আসলে এসব তার খুব ভালো লাগে। এই গ্রাম্য আমোদ-প্রমোদের মধ্যে, এইসব আটচালার চণ্ডীমণ্ডপে ঘোরাঘুরির মধ্যে জীবনকে সে এতদিনে খুঁজে পেয়েছে। উঠতে ইচ্ছে করে না তার, বিশেষত যখন অল্পদিনের মধ্যে এদেশ থেকেই সে চলে যাচ্ছে, আবার কতদিন পরে ফিরবে তা কে জানে!

কি সুন্দর চাঁদ উঠেচে এখানকার আকাশে, কি চমৎকার সুগন্ধ এখানকার মাটির পথে পথে!

রামলাল বললে—এত রাত হল কেন রে তোর? আমরা সবাই না খেয়ে রয়েছি যে—

খাওয়াদাওয়ার পর পিতাপুত্রে নানারকম বৈষয়িক পরামর্শ হল। হানিডাঙ্গার বটকৃষ্ট তরফদার দু'টাকা ন'আনা খাজনা দেয়, একখানা দাখিলা সই করে তাকে পাঠিয়ে দিতে হবে ভাদ্র কিস্তির জন্যে। পুকুরের পাড়ের বাঁশঝাড় থেকে দশ টাকার বাঁশ বিক্রি করতে হবে পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের কাছে। পুকুরটা নিকিরিদের কাছে জমা দিয়ে দিতে হবে। হাতে কিছু টাকা দিয়ে যেতে হবে শ্যামলালের মাকে।

হাওড়া থেকে ট্রেনে চড়বার সময় রামলাল ও শ্যামলাল পরস্পরের দিকে চাইলে। কলকাতা পর্যন্ত তো এক রকম বেশ এসেছে ওরা, এ তেমন অজানা নয়। অজানার উজানে পাড়ি শুরু হল এবার। ঘরবোলা লোক

ওরা, অতিকষ্টে চিঁড়ের পুঁটুলি, আমসত্ত্ব ও পাটালি বেঁধে বিদেশে পা বাড়িয়েচে। শ্যামলালের বয়েস পঁচিশ বছর হলে কি হয়, মনে এখনো সে বালক, বা তার বাপ-মাও তাকে বালকই ভাবে। আসবার সময় ওর কড়ে আঙুল কামড়ে পর্যন্ত দিয়েচে ওর মা। বি.এন.আর. রেলে ওরা কখনো চড়েনি, হাওড়া স্টেশনও কখনো দেখেনি।

ট্রেন ছাড়লো সন্ধ্যার কিছু আগে। দুধারে রেলের ইয়ার্ড, অপরিষ্কার বস্তি, কলকারখানা। এত ঘিঞ্জি জায়গা! আন্দুল, মৌরীগ্রাম, চেঙ্গাইল্—কোনো জায়গায় এতটুকু সৌন্দর্য নেই। না গাছপালার সৌন্দর্য, না ভূমিশ্রীর কমনীয়তা। সব চেয়ে মনে হল শ্যামলালের, এ সব দেশে নির্জন জায়গা নেই কেন, তাদের গ্রামের বা তার আশেপাশের বিস্তীর্ণ মুক্ত প্রান্তর বা নদীর ধারের মত? যেখানেই বসবে এখানে, সেখানেই লোক। নির্জনে একমনে বসে ভাববার মতো এতটুকু জায়গা নেই কি এদেশে! ভাগ্যিস্ তাদের বাড়ি এসব অঞ্চলে হয়নি তাই রক্ষে! তার কবি-মন যেন শিউরে ওঠে।

সে বললে—বাবা, ঘুমুলে নাকি?

রামলাল বৃদ্ধ ব্যক্তি, সারাদিনের পথশ্রমে কাতর অবস্থায় চোখ বুজে শুয়ে শুয়ে ভাবছিল, শ্যামাকে নিয়ে যাচ্ছে তা সম্পূর্ণ অজানা বিদেশে, ভালো হল কি? ছেলেটার ভবিষ্যতের জন্যেই সেখানে যাওয়া, তার নিজের জন্যে নয়। সে জানে তার ছেলে কবি ধরনের। সাংসারিক কাজকর্মের তত উপযুক্ত নয়। ওর ঘাড়ে শক্ত কাজের ভার দিতে বা সাংসারিক দায়িত্বের চাপ দিতে পারবে না রামলাল। ওর মনের স্বাধীন আনন্দকে সে নষ্ট করে দিতে চায় না। রামলাল চোখ বুজলে তারপর যা হয় হবে।

রামলাল এই বিদেশে আসবার মতলব করেনি শুধু নিজের ইচ্ছাতে। এর পেছনে আছে তাদের স্কুলের ভূতপূর্ব হেডমাস্টার ভুবন মুখুয্যের পরামর্শ। ভুবন মুখুয্যে সেকালের এন্ট্রান্স পাশ, বয়েস অনেক হয়েচে, রামলাল ১৯১২ সালে প্রথম ভুবন মুখুয্যের অধীনে মাইনর স্কুলের হেড পণ্ডিতি কাজে ভর্তি হয়। রামলালদের গ্রাম পাঁচঘরাতেই। ভুবন মুখুয্যে ঘরদোর বেঁধে গত চল্লিশ বছর বাস করছেন। ভুবনবাবু আনন্দমোহন বসুর বিশেষ ভক্ত-শিষ্য, নিজে যদিও আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম নন, তবুও ধর্মমতে অতখানি অজ পাড়াগাঁয়ের গোঁড়ামি থেকে সম্পূর্ণ উদার ও স্বাধীন।

ভুবনবাবু বলতেন—জানো, আজকাল ছেলেরা বিলেত যায়, বাপের টাকা খরচ করে আসে। বিলেত গিইছিল বাপের ব্যাটা আনন্দমোহন বোস। কেমব্রিজ টের পেয়ে গিয়েছিল ছেলে একখানা এসেছে বটে! ইউনিভার্সিটি ইউনিয়নে এমন বক্তৃতা দিলে ব্রিটিশ কুশাসনের বিরুদ্ধে যে বিলিতি ছোকরার দল অবাক হয়ে গেল। হেনরি ফসেট ছিলেন পার্লামেন্টের জাঁদরেল মেম্বর, তার সঙ্গে এমন বন্ধুত্ব হল যে ইলেকশ্যনের সময় হেন্‌রি ফসেটের প্রতিনিধি হয়ে ব্রাইটনে ভোটারদের মধ্যে আনন্দমোহন বসুকে বক্তৃতা করতে হয়—সে বক্তৃতা কাগজে পড়ে ফসেট বললে, আমি এর চেয়ে ভালো বক্তৃতা করতে পারতুম না—হ্যাঁ,ছাত্র বটে!

সেই ভুবনবাবুই বলেছিলেন, ওহে, গর্তের মধ্যে ফেলে রেখো না ছেলেকে। দূরে পাঠাও, চোখ মুখ কান ফুটতে বড় সাহায্য হয় ওতে। কার মধ্যে কি থাকে কে জানে? বিদেশ যেতে দাও—মায়ের আঁচল ধরে থাকবে কেন চিরকাল?

শ্যামলাল আবার বললে—ও বাবা, ঘুমুলে?

রামলাল ধড়মড় করে উঠে বসে বললে—না বাবা, গাড়ির ঝাঁকানিতে একটু তন্দ্রা এসেছিল। খিদে পেয়েচে, খাবি কিছু?

—না, এই তো খাবার খেয়ে এলাম হাওড়া ইস্টিশান থেকে! তুমি ঘুমাও।

সারারাত্রির মধ্যে ভাল ঘুম এল না রামলালের। কোথায় যাচ্চে, কিসের মধ্যে, সম্পূর্ণ অজানার উদ্দেশ্য—কি এর পরিণাম হবে কে জানে? রামলাল নিজের জন্যে মোটেই ভাবে না, ভাবে তার ছেলের জন্যে। নিজের তো তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেচে, এখন যাতে ছেলেটার কোনো ভবিষ্যতের সুব্যবস্থা করতে পারা যায়। পল্লীগ্রামের ইস্কুল-মাস্টারির যা পরিণাম, সে তো নিজেকে দিয়েই সে বুঝতে পারচে।

এই দূর অজানা বিদেশে যদি তার মৃত্যুও হয়, তবুও তার ক্ষতি নেই কিন্তু সে যেন ছেলের সুরাহা দেখে মরতে পারে।

শরকালী গাঙ্গুলী কেমন লোক হবে কে জানে?

ছেলেকে ডেকে বললে—হ্যাঁরে, তোর এই মামা কেমন লোক শুনেছিস?

—ভাল লোক।

—সে আমি খানিকটা জানি। একসময় আমাদের সংসারের কিছু কিছু সাহায্য করতেন—

—কেন?

—ওর বোনকে ও পাঠাতো। সংসারের কষ্টও তো ছিল।

—তুমি নিতে কেন ?

—সে তুমি বুঝবে না বাবা। একবার ছ'মাস অসুখে পড়ে রইলাম। অতি কষ্টে চাকরিটা বজায় রাখলাম ইন্‌সপেক্টর আফিসে লিখে। কিন্তু খাই কি? তোমার গর্ভধারিণী তখন লিখলে তার ভাইয়ের কাছে। শরৎকালী দাদা সেই মাসেই দশ টাকা পাঠিয়ে দিলেন—তারপর মাসে মাসে দশ টাকা করে পাঠাতেন। এবার খাবি কিছু? খেয়ে শুয়ে পড়—

তার পরদিন ভোরের দিকে ঘুম ভাঙলো রামলালের। বেজায় ভিড়ে ঘুম আদৌ ভাল হয়নি। তবে রাত তিনটের পর কি একটা বড় ইস্টিশানে গাড়ি এল, সেখানে অনেক লোক নেমে যাওয়াতে গাড়ির ভিড়টা পাতলা হয়ে গিয়েছিল। ঘুম যেটুকু হয়েচে, তারপর। তার আগে চোখ বুজতে পারা যায়নি।

শ্যামলাল ধড়মড় করে উঠে বসে দু'হাতে চোখ কচলে বাইরের দিকে চেয়ে বললে—বাঃ বাঃ, বাবা দেখ্‌চো বাইরের দিকে?

—উঠলি? কি দেখবো?

—সুন্দর দেশ না! এত ফাঁকা জায়গা দেখেচ কখনো বাংলা দেশে? ওই দ্যাখো বাবা, ওগুলো নিশ্চয় পাহাড়—বাঃ বাঃ, কি চমৎকার! নীল নীল পাহাড় কেমন দেখাচ্চে বাবা? এতদিন ছবিতে দেখেছিলাম—এইবার চোখে দেখলাম। তাকিয়ে দ্যাখো বাবা—

—দেখ্‌চি। বেশ।

আসলে রামলালের ওসব দিকে তত দৃষ্টি ছিল না। পাহাড়-টাহাড় দেখে দুটো হাত বেরুবে কারো? শ্যামলাল ছেলেছোকরা, সে দেখুক দিয়ে ওসব। একসময়ে তারও কবি-দৃষ্টি ছিল। সংসারের ভীষণ চাপে সব শুকিয়ে গেল কিনা! আর এই একঘেয়ে ইস্কুল-মাস্টারি যে কি দুঃখের, যে দীর্ঘদিন ধরে করেছে সে-ই জানে।

এখন আর কিছু নয়, খোকাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই তার জীবনের ব্রত। এই মহাব্রত উদ্‌যাপন করবার জন্যেই দিক্‌দিশাহীন এই অকূলে রামলাল দুঃসাহসিক পাড়ি জমিয়েচে এই বুড়ো বয়েসে। মরণে সে ভয় পায় না—তার আগে খোকাকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে যদি যেতে পারা যেতো!

শ্যামলাল উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলো—দ্যাখো বাবা, এই সরুমত পথটা কেমন পাহাড়ের ওপর দিয়ে উঠচে—কি সুন্দর সিনারি!

—হুঁ

—আচ্ছা বাবা, ওগুলো কিশালগাছ ?

—বোধ হয় তাই হবে। হ্যাঁরে খোকা, তোর কি মনে হয়?

—কিসের কি মনে হয়?

—বিদেশে গিয়ে ভালো করচি?

—নিশ্চয়।

—তোর মনে সাহস আছে?

—খুব।

—তবেই হবে।

—বাবা, ওসব তুমি কিছু ভেবো না। আমি যখন তোমার সঙ্গে যাচ্ছি তোমার ভাবনা কি? আমার একটা কিছু সুবিধে হলে তোমাকে নড়ে বসতে দেবো ভেবেচ? বসে বসে খাওয়াবো। রামলাল অধৈর্য ভাবে বলে উঠলো—রাম রাম, ওসব কথায় এখন দরকার নেই—

—কি ভাবচো বল তো?

—নানান ভাবনা ভাবচি, বিদেশে কতদিন আমাদের লোকে খেতে দেবে? আর তা খাবোই বা কেন? অল্পদিনের মধ্যে একটা কিছু ব্যবস্থা করে নিতে পারা যাবে কিনা—

—শালবনটা দ্যাখো বাবা—

—বেশ।

—না, ভালো করে তাকিয়ে দ্যাখো না? ওটা বোধ হয় পাহাড়ী নদী বয়ে যাচ্ছে! কি বড় বড় পাথর পড়ে আছে! অত পাথর এল কোথা থেকে বাবা?

—পাহাড়ের দেশ, তা পাথর আসবে না? যাক সে কথা। তোর গর্ভধারিণী চিঠি দিয়েছে তোর শরৎকালী মামার কাছে তো? আমাদের সে চেনে না, কখনো দেখেনি, কি যে হবে, তাই ভাবচি—

—বড্ড ভাবো তুমি বাবা। সে যা হয় হবে। তুমি এখন সিনারি দ্যাখো তো? ওই দ্যাখো একটা পাহাড়ের চুড়ো যেন মন্দিরের মত। পাহাড় দেখে চোখ যেন জুড়িয়ে গেল—আঃ—শ্যামলাল একটা আরামের দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে শেষের দিকে।

ওর বাবা বিরক্ত হয়ে বললে—পাহাড় খেয়ে তো পেট ভরবে না বাবা—

—তুমি কিছু ভেবো না বাবা। তোমার ভার আমি নেবো।

রামলাল আবার বিরক্ত হয়ে উঠলো। ওই সব অবাস্তব ছেলেমানুষি কথা ওর ভালো লাগে না। কবিত্ব করলে তো পেট ভরবে না। বাপের মনের দুঃখ ওই সব উচ্ছ্বাসে-ভরা ছেলেছোক্‌রা কি বোঝে! আজকাল যে নিজের পায়ে দাঁড়ানো কত দুরূহ কাজ, যে অভিজ্ঞ লোক, সে-ই জানে। এসব ছেলেছোক্‌রা কখনো জানে সংসারের দুঃখের বার্তা, না রামলাল ওকে বুঝতে দিয়েচে? ডানা দিয়ে সযত্নে সস্নেহে ঢেকে রেখেচে না এতদিন! কাজেই সে এখন কেন পাহাড়-টাহাড়, সিনারি-ফিনারি দেখবে না?

বেলা দশটার সময় রেলপথের দু'দিকের জঙ্গল এত নিবিড় হয়ে উঠলো যে অ-কবি রামলালও যেন অবাক্ হয়ে গেল। না, দেশটা যেন বড্ড জঙ্গলে ভরা! এখানে ডাক্তারি চলবে? শ্যামলালই বা এখানে কি করবে বুঝতে পারা গেল না।

ধুরুয়াডিহি স্টেশনে নেমেও এই কথাই মনে হল ঠিক। শরৎকালী গাঙ্গুলী স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত ছিলেন। রোগা, ফর্সা চেহারা। সত্তরের ওপর বয়েস হবে হিসেবমতো— কিন্তু পঞ্চাশের বেশি দেখায় না। না, দেশের জল-হাওয়ার গুণ আছে বলতে হবে। শরৎকালীবাবুর চোখে পুরু চশমা, হাতে রুপো-বাঁধানো পাহাড়ী কাঠের ছড়ি, গায়ে একটা গরম কাপড়ের ফতুয়া। এখন গরম কাপড়ের ফতুয়া গায়ে কেন, রামলাল বুঝতে পারলে না।

রামলালকে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন—এসো ভায়া। একা পড়ে থাকি, বাঙালীর মুখ দেখতে পাই নে, কখনো তো আসতে না! এসেচ বড্ড ভালো করেচ। একটা কথা, চলে যেতে পারবে না এখান থেকে। অন্নপূর্ণাকেও কেন নিয়ে এলে না? কতদিন দেখিনি—

শ্যালকের ব্যবহারটি বেশ উদার ও খোলাখুলি। রামলালের মনের যে সংকোচ, উদ্বেগ ও আশঙ্কা ছিল, এই শুভ্রবেশ সৌম্যদর্শন ভদ্রব্যক্তির আবির্ভাবে যেন এক মুহূর্তে সব কেটে গেল।

সে হেসে বললে—আপনি তো বললেন দাদা, তাদের আনা কি সহজ? সেখানেও তো একটা সংসার—গরু আছে, বাছুর আছে, আম কাঁঠাল গাছ আছে—সব ফেলে কি আসা চলে হঠাৎ দাদা?

—না, না, আমি বলি শোনো ভায়া। এসো বাবাজী, দীর্ঘজীবী হও। বেশ ছেলেটি। নাম কি বললে, শ্যামলাল? বেশ, বেশ। কতদূর পড়াশুনো করেছিলে ?

রামলাল এর উত্তর দিলে। বললে—বেশি না দাদা। অবস্থা তো বুঝতেই পারচেন, কোথা থেকে বেশি পড়াবো! তবে ও বাড়ি বসে খুব পড়াশুনো করেচে। ওই ওর বাতিক। আর বেশ কবিতা লেখে।

শরৎকালীবাবু হেসে বললেন—বেশ ভালো। তবে কবিতা ফবিতায় কাজ হবে না বাবাজী। বাস্তব জীবনে কবিতা-ফবিতার স্থান কোথায়? ওসব বইয়ে পড়তেই মিষ্টি লাগে। এখন এখানে এসেচ, পুরুষমানুষ—যাতে দু'পয়সা রোজগার করতে পারো, তার চেষ্টা করতে হবে। পয়সারোজগারের অনেক ফন্দি আছে এখানে—চাই শক্তিমান বুদ্ধিমান লোক। তোমার মাকে যাতে এখানে এনে ফেলতে পারো, তার চেষ্টায় থাকো। ও ম্যালেরিয়ার দেশে আর ফেলে রেখো না। আচ্ছা চলো—বাড়ি চলো বাবাজী, চলো ভায়া—সে সব কথা পরে হবে এখন—

॥৪॥

শ্যামলাল ওঁদের পেছনে পেছনে চললো। স্টেশন থেকে বেরিয়েই সামনে বাজার, খোলার চালার নিচে চায়ের দোকান, ঘেঁষাঘেঁসি বস্‌তি, নোংরা রাস্তা, হনুমানজীর মন্দির, শ্যামলাল অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো। বাজার ছাড়িয়ে একটা ফাঁকা জায়গা, বড় একটা গাছের ছায়ায় একটা বাংলো ঘর, সামনে হিন্দিতে একটা কাঠের তক্তার গায়ে লেখা আছে, রেঞ্জ্ অফিস, করমপদা রেঞ্জ্, ধুরুয়াডিহি। এই বাংলো ঘরের পেছনেই একটা গির্জাঘর এবং আর একটা ভালো সাহেবী ধরনের ছোট বাড়ি। শ্যামলালের মনে হল গির্জার পাদ্রি সাহেবের থাকবার বাসা। গির্জার পরেই একটা বড় দোতলা বাড়ি, তার সামনে ফুলবাগান, ছোট্ট একটা পুকুর। পেছনে অনেকখানি জায়গা উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, অনেক ফলের গাছ তার মধ্যে। এমন জায়গায় এ ধরনের একখানা শৌখিন বাগানবাড়ি কাদের? প্রশ্নটা শ্যামলালের মনে উঠলেও সাহস করে জিগ্যেস করতে পারলে না মামাবাবুকে।

এইবার বাঁক ঘুরেই পথের পাশে বড় একটা খোলার বাড়ি পড়লো, নিচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। শরৎকালী বাবু বললেন—এই গরিবের কুঁড়েঘর ভায়া। এসো এসো। ও পিন্টু, পিন্টু—

একটি গিন্নিবান্নি ধরনের মহিলা রামলালের সামনে এসে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বললেন—কি, এত কাল পরে মনে পড়লো? ঠাকুরঝি ভাল আছেএ কে? খোকন বুঝি? এসো এসোবাবা, বেঁচে থাকো, দীর্ঘজীবী হও—চলো বাড়ির মধ্যে। বড় গরম। আগে নেয়ে-ধুয়ে ঠাণ্ডা হয়ে নাও, এসো ঠাকুরজামাই।

অবস্থা যে বেশ সচ্ছল এদের, শ্যামলালের বুঝতে দেরি হল না, ঘরের আসবাবপত্র দেখে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা খুবই ভালো। দেশের বাড়িতে এ ধরনের খাবার কালেভদ্রেও জোটে না। রামলাল বললে—দাদা, এ ঘি আমাদের দেশে চক্ষেও দেখবার জো নেই। বড় চমৎকার ঘি—

শরৎকালীবাবু বললেন—এখানকার ঘি নয় ভায়া। আমার এক রুগীকে দিয়ে দেহাত থেকে আনিয়েচি—একেবারে খাঁটি—চার টাকা সের।

—এ সব বাংলাদেশে চক্ষে দেখবার উপায় নেই আজকাল দাদা—

—বাড়িতে গরুও আছে আমার। সের-তিনেক দুধ হয়। একটু করে গাওয়া ঘি করেন তোমার বৌদিদি—আসল কথা, এদেশে আছি একরকম মন্দ নয়।

—বাংলা দেশের জন্যে মন-কেমন করে না?

—করে বইকি ভায়া। কিন্তু ছেলেমেয়েদের এদেশেই জন্ম, ম্যালেরিয়ার দেশে গেলে ওদের শরীর একদিনও টিকবে না। সেই জন্যেই যাওয়া হয় না। বিষয়-সম্পত্তি যা আছে, খুড়তুতো ভাই শচীন আর যামিনী খাচ্চে। খাক গে। এতকাল পরে যামিনী জমি বিক্রির দরুন দেড়শোটি টাকা দয়া করে পাঠিয়েছিল। সে তার দয়া, না পাঠালেই বা কি করচি? পাকিস্তান থেকে নাকি বহু লোক এসে পড়েচে গ্রামে, তাদের কাছে জমি বিক্রি করেচে।

—এখানে আসেনি পাকিস্তানের লোক?

—না। এতদূরে এ জঙ্গলের দেশের সন্ধান পায়নি। কিন্তু এলে ভালো করতো। এখানে মাথা খাটালে পয়সা রোজগার হয়। বাংলাদেশ থেকে আজকাল বেরিয়ে পড়া দরকার, দেশে মাটি আঁকড়ে থাকলে আর অন্ন হবে না। বহুৎ লোক বেড়ে গিয়েচে।....একে বলে বোম্বাইয়েরকলা, রং দেখতে খারাপ কিন্তু খেয়ে দ্যাখো।বাড়িতে ছ'সাত ঝাড় লাগিয়েচি পেছনদিকে। এ মাটিতে খুব ভালো ফলে—

খাওয়া-দাওয়া শেষ হল। রোদ বড্ড চড়েচে। বাংলা দেশের চেয়ে অনেক গরম। ওদের ট্রেনে ভাল ঘুম হয়নি। দুপুরে লম্বা ঘুম দিয়ে বিকেলের দিকে বাইরের বারান্দায় বসে চায়ে চুমুক দিতে দিতে দেশের খুঁটিনাটি গল্প করতে লাগলো রামলাল। শরৎকালীবাবুই নানারকম প্রশ্ন করতে লাগলেন ওকে, দেশের সংবাদ বড্ড ভালো লাগছিল বাংলা দেশ থেকে সদ্য আগন্তুক একজন লোকের মুখে। কতদিনের তৃষ্ণা, এমন টাটকা জল আকণ্ঠ পুরে পান করেও আশা মেটে না। বলো বলল, শুনি! মহাভারতের কথা অমৃত সমান!

রামলাল বললে—যতই যা বলি, আজ এয়েচি আজই মন-কেমন করচে দেশের জন্যি।

শ্যামলাল বললে—আমারও।

শরৎকালীবাবু হেসে উঠে বললেন—সব সেরে যাবে ভায়া, পয়সার মুখ দেখবে যেদিন থেকে, সেদিন থেকে সব সেরে যাবে। আমার হত না ভাবচো? ভেবে দেখলাম আমার মত সেকেলে কোয়ালিফিকেশন নিয়ে দেশে ফিরে খাবো কি? না খেয়েই মরে যেতে হত। কাজেই রয়ে গেলাম।

—আপনি আমার সম্বন্ধে কিছু ভেবেচেন?

—কিছু ভাবচি বইকি। নইলে কি আর আসতে লিখি?

—কি বলুন না? একটু শুনে মনটা ঠাণ্ডা করি। এই বাজার, তার ওপর চাক্‌রিটা গেল। সংসার চালাই কি করে সেই হল ভাবনা! বিদেশে কি আর ইচ্ছে করে কেউ আসে দাদা!

—এসেচ খুব ভাল করেচ। ঘরবোলা হয়ে না থেকে তুমি যে এ বয়সে বেরিয়ে পড়েচ এটাই মস্ত কথা। শ্যামলালকেও বলি, তোমার বয়েস কম, এই খাটবার বয়েস লেগে যাও কাজে।

—কাজটা কি দাদা?

—সে আমি জানিনে। তোমরা দেখে নাও। আমি সাহায্য করবো পেছন থেকে। এখানে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারি চলে, কাঠের ব্যবসা চলে, কোনো কাঠের আড়তে কেরানীগিরি করা চলে।

রামলাল যেন একটু দমে গেল। শ্যালকের কাছে এসেচে সে অনেকখানি আশা নিয়ে। এ ধরনের কথাবার্তা তার ভাল লাগলো না।

শ্যামলাল বললে—মামাবাবু ঠিকই বলেচেন বাবা। আমাদের জিনিস আমাদের নিজেদের ঠিক করে নিতে হবে বইকি। আচ্ছা মামাবাবু, একটা বাগানবাড়ি ওখানে কাদের?

—ও হল কলকাতার জগৎ চৌধুরী বলে এক বড়লোকের।

—কেউ থাকে এখানে ওঁদের ?

—থাকে।

হঠাৎ যেন এ প্রসঙ্গকে চাপা দেবার জন্যেই শরৎকালীবাবু বললেন—তা হলে এইবার একটু বেড়াতে যাওয়া যাক্, কি বলো?

রামলাল বললে—যা বলেছেন, চলুন।

শরৎকালীবাবু ওদের নিয়ে কিন্তু বেশিদূর গেলেন না। স্টেশনের উল্টোদিকের উঁচু টিলা মত জায়গায় গিয়ে খানিকটা বসলেন। শ্যামলাল মুগ্ধ দৃষ্টিতে পশ্চিম দিগন্তের নীল পর্বতমালার দিকে চেয়ে বললে—ওটাকি পাহাড় ? ওতে বাঘ আছে? ভালুক আছে?

শরকালীবাবু হেসে বললেন—নাঃ, বাবাজী এখনো দেখচি নিতান্ত ছেলেমানুষ! কথাবার্তাও ছেলেমানুষি! এখানকার সব পাহাড়ে বুনো হাতি, বাঘ, ভালুক আছে, হরিণ আছে, বাইসন আছে ।

রামলাল বললে—বাইসন কি?

—একরকমের বুনো মোষ। তা ছাড়া বড় বড় সাপ আছে।

—কি সাপ?

—পাহাড়ী ময়াল সাপ যাকে বলে। বিষাক্ত সাপ আছে।

—এদেশে থাকতি ভয় করে না দাদা?

—সাহস না করলে লক্ষ্মীলাভ হয়? এক-একজন মাড়োয়ারি—

শ্যামলাল এসব কিছু শুনছিল না। সে একদৃষ্টে চেয়ে ছিল দূর পূর্বদিগন্তে। এখান থেকে অনেক দূর তাদের দেশ। তার মা নিশ্চয় তার কথা ভাবচে। এতদূরে সে এসে থাকতে পারতো না বাবা সঙ্গে না এলে। বই পড়ে পড়ে দূর বিদেশে যাওয়ার স্বপ্ন কত দেখে এসেচে এতদিন! কিন্তু বিদেশ ভালো জায়গা নয়। বিদেশে এলে বাড়ির জন্যে মন-কেমন করে। পরের বাড়ি ভালো জায়গা নয়। যতই তারা আদর করুক, যত্ন করুক, তবু সেখানে আড়ষ্ট-আড়ষ্ট লাগে। পরের বাড়িতে থাকতে না হলে বোধ হয় বিদেশ খানিকটা ভালো লাগতো।

শুক্লপক্ষের চতুর্থীর এক ফালি চাঁদ উঠেচে মাথার ওপরে। ছোট্ট টিলাটার গাছপালায় ক্ষীণ জ্যোৎস্না পড়েচে। সেইটুকু মাত্র জ্যোৎস্নায় সমস্ত জায়গাটা যেন মায়াময় হয়ে গিয়েছে। বড় অদ্ভুত দেশ। একে পাহাড় বলে ? দূরের ঐ বড় পাহাড়গুলোতে কি আছে? শ্যামলাল ও সব পাহাড়ে উঠে দেখবে কি আছে।

শ্যামলাল বললে—পাহাড়টা কত দূরে মামাবাবু?

—তিন মাইলের কম নয়। পাথরগাঢ়া বলে একটা ফল্‌স্ আছে ঐ বনের মধ্যে, মাইল তিনেক দূরে। একদিন দেখিয়ে আনবো।

—কবে যাবেন?

—দু-একদিন যাক্। তাড়াতাড়ি কি? নিয়ে যাবো। এসব দেখতে ভালো লাগচে?

—ওঃ, কি চমৎকার! আমি কখনো ভাবিনি যে এমন জায়গা আছে। ঐ সমস্ত আমি একা একা বেড়াবো।

—বেড়িও বাবা। তার আগে দু-পয়সা রোজগার যাতে হয়, তার চেষ্টা পেতে হবে।

শ্যামলাল খুব বুঝেচে। এই বাজারে দুটি প্রাণী একজনের ঘাড়ে বসে বসে খাবে, হলই বা সে আপন মামা, এতে বড় বাধ-বাধ ঠেকে। অবিশ্যি মামাবাবু খুব ভালো লোক, তিনি কিছু মনে করবেন না। কিন্তু তাদের তো একটা বিবেচনা আছে। নাঃ, সে চলবে না।

দু-তিন দিন পরে শ্যামলাল বিকেলের দিকে একা বেড়াতে বেরিয়েছে, স্টেশনের ওপারে একটি বৃদ্ধ লোককে নিচু হয়ে কি খুঁজতে দেখে কাছে গিয়ে বললে—কিছু হারিয়েছে আপনার?

বৃদ্ধ লোকটির গায়ে মেরজাই, মোটা থান পরনে, পায়ে নাগরা জুতো। মুখ তুলে বললে— হাঁ বাবুজী, একঠো রুপেয়া গির গিয়া। আভি গিরা—

শ্যামলাল হিন্দি না জানালেও আন্দাজে ব্যাপারটা বুঝলে। একটু খুঁজবার পরে শ্যামলালই একটা পাথরের তলা থেকে টাকাটা পেলে। বৃদ্ধ হেসে ওর দিকে চেয়ে বললে—বহুৎ আচ্ছা বাবুজী। আপকো তো নেহি দেখা ইহা পর? আপ নয়া আয়া?

—আমি শরৎকালীবাবুর বাড়ি এসেছি।

—আচ্ছা! শরৎবাবুকা মকান মে? আপ চলিয়ে না মেরা গরিবখানাপর!

শ্যামলাল শেষ কথার অর্থ ভালো রকম বুঝতে না পারলেও কোথাও যেতে বলচে, এ কথাটা বুঝলে। সে বললে—চলুন।

—চলিয়ে বাবুজী, আপকা কৃপা।

শ্যামলাল দেখলে, চল্‌তে চল্‌তে ওরা সেই দোতলা বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়িয়েচে। বৃদ্ধ বিনম্র হেসে বললে—মেরা গরিবখানা। আপ পধারিয়ে—

এত কেতাদুরস্ত বিনয় শ্যামলাল সহ্য করতে পারছিল না। একে সে আদৌ হিন্দি জানে না, তার ওপর তার বাবা-মামার বয়সী একজন বৃদ্ধ লোকের এতটা বিনয়পূর্ণ কেতাকায়দা! বাড়িতে ঢোকবার তার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু গরিবখানা শব্দের অর্থ না বুঝে সে যখন একবারে বুড়োর বাড়ির সামনে এসে পড়েচে, তখন আর ফেরা চলে না। কি বিপদই পড়ে গেল আজ! মামাবাবু শুনে হয়তো বকবেন!

বৃদ্ধ শ্যামলালের হাত ধরে বৈঠকখানায় নিয়ে ঢোকালে। জোড়া তক্তপোশের ওপর জাজিম আর সাদা চাদর পাতা, বড় বড় গোটা-পাঁচ-ছয় তাকিয়া, দু-তিনখানা চেয়ার, ছোট একটা টেবিল। দেওয়ালে একটা ক্লকঘড়ি টক টক করচে। একটা অদ্ভুত ধরনের সেকেলে বনিয়াদি আবহাওয়া ও পুরনো মরচে-পড়া গন্ধ ঘরের মধ্যেটায়। শ্যামলাল কখনো এমন দেখেনি। তার ভারি ভালো লাগলো।

ওকে বসিয়ে রেখে বৃদ্ধ বাড়ির মধ্যে ঢুকেই মিনিটখানেক পরে বার হয়ে এসে ওর পাশে বসলো।

বললে—আপকা নাম বাবুজী?

নাম শুনে বললে—শরৎবাবু আপকো কৌন লাগ্‌তা?

—কোথায় থাকেন?

—না না, আপনার উনি কে আছেন?

—ও, উনি আমার মামা।

—তব্ তো ঠিকই হ্যায়। হামিও আপনার মামা হোয়ে গেলো। শরৎবাবুসে বহুৎ দোস্তি আছে হামার।

—আজ্ঞে!

—হামার নাম আছে রামজীবন পাঠক। হামার কারবার আছে টিম্বারকা। সম্ঝে? সাড়ে দশ টাকা লিয়ে কছ্সে আয়া থা বাবুজী, আজ সেই ছত্তিষ বরষ বীত গিয়া—সমঝা? আজ পরমাত্মাকো কৃপা সে আউর আপলোগোকা কৃপা সে—

এই সময় একজন চাকর একখানা কানাউঁচু পিতলের বগিথালার ওপরে দুটো কাঁচের গ্লাস ভর্তি চা এবং চিনেমাটির প্লেটে নিম্কি গজা জাতীয় কি খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকলো। বৃদ্ধ কথা বন্ধ করে বললে—বাবুজী, থোড়া চা পিজিয়ে কৃপা করকে—

বৃদ্ধ শুধু চা খেতে লাগলো, খাবারের প্লেট শ্যামলালের সামনে ধরে দিলে। নিম্কি-গজাগুলো ভারি সুন্দর খাস্তা, বাজারে এমন চমৎকার ঘিয়েভাজা খাবার আজকাল—উঁহু এ এই বুড়োর বাড়ির তৈরি, হাজার হোক্ বড়লোক তো! সত্যিকার বড়লোক। চায়ের সঙ্গে দারচিনি সেদ্ধ করেচে কেন? আর এত চিনি খাওয়া যায় চায়ের সঙ্গে? চা নয়, এ এক ধরনের গরমমশলার শরবৎ!

—বাবুজী আউর থোড়া নম্কী—

শ্যামলালের চট্কা ভেঙে গেল। ওকি, আর এক প্লেট গরম নিমকি-গজা ভাজা এনেছে যে চাকরটা! না না, অতগুলো নিম্কি-গজা এই অবেলায়—

—থোড়া খাইয়ে বাবুজি। আপকো উমর তো আভি বহুৎ কম হ্যায়। এ সময় খাবেন না তবে কি আমার মত বুড়টা হোলে তবে খাবেন? খান খান—থোড়া দহি খাবেন?

—আজ্ঞে না না। চায়ের সঙ্গে দই খেলে বাঁচবো না!

রামজীবন পাঠক হো হো করে হেসে উঠে বললে—নেহি বাঁচিয়েগা! একদম মরিয়ে যাবেন! নেহি, তব্ রহ্নে দিজিয়ে। পান মাগায়েঙ্গে?

—আজ্ঞে, পান খাইনে।

—বিড়ি সিগ্রেট্?

—আজ্ঞে, মাপ করবেন। ও সব খাইনে কখনো।

রামজীবন পাঠক সন্ধ্যের পর পর্যন্ত ওকে বসিয়ে প্রধানত বলতে লাগলো নিজে সে কি করে বড় ব্যবসাদার হয়েচে। কেমন করে পিট্হেড সাহেবের আমলে তিন হাজার টাকায় সত্তর একর জমির শালবন নিলাম ডেকে সাতষট্টি হাজার টাকায় বিক্রি করে!

—ও বখ্ত্ জঙ্গল কোই নেহি লেতা।

—কেন?

—আরে বাবুজী, জঙ্গল ইস্সে বহুৎ ঘন থা, জানোয়ার ভি বহুৎ কিসিম থা!

—জানোয়ার কি এখন নেই?

—বহুৎ হ্যায়। আজকাল হাঁথি বড় গয়া, বাইসন কম্‌তি হুয়া। শের ইধারসে উড়িষ্যা স্টেট্ ফরেস্টে মে ঘুষ গিয়া—শের সমঝালেন? বাঘ উঘ্—

—বুঝেচি। শের মানে বাঘ ইতিহাসে পড়েছিলাম, শের শার কথা পড়বার সময়।

—ঠিক হ্যায়। ইলিমদার আদমিয়োনে সব কুছ সমঝ্‌তা। আপনি এখানে কেতোদিন আছেন?

—কিছু কাজ করবো বলে এসেছি।

—কৌন্ কাম?

—যে কোনো কাজ হয়। বাবা ইস্কুলে মাস্টারি করতেন। ষাট বছর বয়েস হল বলে রিটায়ার করতে হল। এখন দেশে কি করে চলবে? তাই মামাকে চিঠি লেখা হল, মামা আসতে লিখলেন, এসেও পড়লাম। আজ চারদিন হল। কি করবো এখনো ঠিক হয়নি।

—আপনি আংরেজি লিখাপঢ়া জানেন জরুর?

—হুঁ।

—চিট্টি-উট্টি আনেসে পঢ়নে সেক্তা?

—খুব। তবে খুব শক্ত ইংরিজি জানিনে। মোটামুটি জানি মন্দ নয়। অনেক বই পড়েচি। খবরের কাগজ পড়ে বুঝতে পারি।

কথা শেষ করে শ্যামলাল সলজ্জ হাসল।

—ঠিক হ্যায় বাবুজী। আপনি এখনো বহুৎ ছেলেমানুষ আছেন। আচ্ছা, আমার গরিবখানায় কাল কৃপা করকে থোড়া আইয়ে গা? এহি সময় পর ? হঁহা পর চা পিজিয়ে গা। বাৎ হ্যায় আপকো সাথ। বৈঠিয়ে বৈঠিয়ে—

শ্যামলাল বিদায় নিতে বাধ্য হল। তার বেশ লাগছিল এই বৃদ্ধের সঙ্গ। বেশ সরলপ্রাণ লোকটি। কিন্তু অনেকক্ষণ সে বাড়ি থেকে বার হয়েচে। পরের বাড়ি, কে কি মনে করবে হয়তো! মামাবাবু লোক ভালো বলেই মনে হচ্ছে, কিন্তু মামীমা যেন তেমন নয়। ওরা এসে পড়াতে মামীমা যে খুশিতে উপচে পড়চেন এমন মনে করবার কারণ নেই।

বাড়ি ঢুকতেই তার কিঞ্চিৎ পরিচয়ও পাওয়া গেল। ওর বাবা ও মামাবাবু কোনদিকে বোধহয় বেরিয়েছিলেন, বাইরের ঘরে ওঁদের দেখা গেল না। মামীমা রান্নাঘর থেকে বললেন—কে?

—আমি শ্যাম।

—এসো বাবা। দু-দু'বার চা করলাম, দুবারই তুমি বাড়ি নেই। যেখানে যাবে, সময়মতো এসো বাবা। চায়ের কেটলি আর ভাতের হাঁড়ি গলায় পড়েচে বিয়ের রাত্তির থেকে সে তো আর নামলো না। দিন দিন কোথায় হাল্‌কা হবো, না ঝঞ্ঝাট বেড়েই চলেচে—এখন চা চড়াবো?

—আমি মামীমা চা খেয়ে আসচি রামজীবন পাঠকের ওখান থেকে। রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে বুড়োর সঙ্গে দেখা। ধরে নিয়ে গেল তার বাড়িতে। এতক্ষণ বসিয়ে বসিয়ে শুধু গল্প করছিল—ছাড়ে না। কালও গিয়ে চা খেতে বলেচে বিকেলে।

—রামজীবনবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েচে! বেশ, বেশ। মস্ত বড় ধনী এদিককার। তা যেও বাবা, ওদের সঙ্গে আলাপ রাখা খুব ভালো। দাঁড়াও, চা করে আনচি। ভাতের হাঁড়িটা নামিয়ে দিচ্ছি করে। একবার খেয়েচ তাই কি, আর একবার খাও। আমিও একটু খাই তোমার দৌলতে।

মামীমা আদর করে চা খেতে দেওয়ার একটু পরেই বাইরের ঘর থেকে শরৎকালীবাবু ডাক দিলেন—ওশ্যামলাল—

শ্যামলাল চায়ের পেয়ালা হাতে করেই বাইরের ঘরে গেল। রামলাল ছেলেকে বেশিক্ষণ না দেখে থাকতে পারে না। ওকে দেখে খুশী হয়ে বললে—কোথায় গিয়েছিলে বাবা? আমার ভাবনা হয়েছিল। পাহাড়-জঙ্গলের রাজত্বে বেশিদূর কোথাও যেও না।

শ্যামলাল রামজীবন পাঠকের ঘটনা বলাতে শরৎকালীবাবু বললেন—কাল যেতে বলেচে? যেও। লোক বেশ ভালো। ওর সঙ্গে আলাপ রাখা দরকার।

তারপর দুই বুড়োতে গল্পের আড্ডা বসে। অনেকদিন পরে শ্যালক ভগ্নিপতির পরস্পর মিলন। বাঙালীর মুখ দেখা যায় না এদেশে। তার ওপর রামলাল একজন গল্প-বলিয়ে লোক। শরৎকালীবাবু এমন লোক অনেকদিন পাননি। সন্দেবেলাটা আগে আগে কাটতে চাইতো না। পোস্টমাস্টার রঘুবীর সহায় এসে মাঝে মাঝে বক্ বক্ করতো বটে কিন্তু রামলাল খাঁটি বাংলায় পাড়াগাঁয়ের একশো ঘটনা রসান দিয়ে দিয়ে যেমন বলতে পারে—এমন শরকালীবাবু আর কোথাও কখনো শোনেননি। কাল থেকে তিনি ভাবচেন, এদের এখানে রেখে দিতে হবে, দুটো কথা বলবার লোক নেই, সন্দেবেলা কোথাও গিয়ে একটু বসি সে জায়গা নেই। বাঁচা গিয়েচে এরা এসে!

শরৎকালীবাবু বললেন—বাবাজী, দু-পেয়ালা চা আনতে পারো বাড়ির মধ্যে থেকে?

—আনচি মামাবাবু।

মনে মনে প্রমাদ গুনলো শ্যামলাল। চা নিয়ে এইমাত্র এক গোলযোগ হয়ে গিয়েচে, আবার চা! যাই হোক মামীমার অপ্রসন্ন মুখে তৈরি করা চায়ের পেয়ালা নিয়ে কিছুক্ষণ পরেই সে বৈঠকখানায় আবার ঢুকলো। বাবাকে গরম চা দিয়ে সুখ। আর এমন সুন্দর চা! দেশের বাড়িতে বাবা চা খেতে পেতো না—না জোটে দুধ, না জোটে এ বাজারে চিনি। কনট্রোলে মাসে তাদের সংসারে আধসের চিনি বরাদ্দ। কে কত চা খাবে! ভেলিগুড়ও আট আনা সের। গরিব ইস্কুল-মাস্টারের সংসারে দিনে কবার চা খাওয়া চলে? বাবা চা খেয়ে বাঁচলো এখানে এসে।

শ্যামলাল ওদের কাছেই বসে। রামলাল সামান্য একটু চা খেয়ে পেয়ালাটা ছেলের সামনে দিয়ে বললে—খাও বাবা।

শ্যামলাল বললে—তুমি খাও না? বাঃ, আমি মামীমার কাছ থেকে খেয়ে এসেচি যে! তুমি ভালো করে খাও না।

রামলাল এবার আষাঢ়ে গল্প ফাঁদলো। সে পল্লীগ্রামের মানুষ, অনেক খুঁটিনাটি ঘটনা জানে পল্লী অঞ্চলের। সামান্য একটা বেগুনের ক্ষেত নিয়ে এমন অদ্ভুত গল্প ফাঁদবে, লোকে হাঁ করে শুনবে নাওয়া-খাওয়া ফেলে। শ্যামলাল বাবার এই গল্প বলার ক্ষমতার উত্তরাধিকারী এবং বাবাকে সে কত ভালবাসে তার এই ক্ষমতার জন্যে। ছেলের মত মুগ্ধ শ্রোতা ও ভক্ত একজনও নেই রামলালের গল্পের।

পাহাড়ে পাহাড়ে অন্ধকারময়ী রাত্রি মুখর হয়ে উঠেচে বনচর শৃগাল ও পক্ষীদের ডাকে। কি সুন্দর ঠাণ্ডা বাতাস রাত্রির! এমন রাত্রে গল্প বলেও সুখ, শুনেও সুখ। এক অতিথিপরায়ণগরিব গেরস্ত অতিথিদের রুই মাছ আর সন্দেশ খাইয়ে কি করে সর্বস্বান্ত হয়ে গেল সে গল্প শুনে শরৎকালীবাবুর চোখে জল এল। বললেন—এমন লোকও আছে আজকালকার বাজারে ভায়া!

—না থাকলি আজও আকাশে চন্দ্রসূয্যি উঠবে কেন দাদা?

শ্যামলাল বাবার উত্তরে খুশী হল। সে কি আর এমনি কবি হয়েচে? বাবার মধ্যে, ঐ গরিব ইস্কুল-মাস্টারের মধ্যে এই দৃষ্টিভঙ্গির, এই চৈতন্যের বীজ সুপ্ত না থাকলে ছেলের মধ্যে আসে?

॥৫॥

পরদিন বিকেলবেলার দিকে শ্যামলাল গিয়ে হাজির হল রামজীবন পাঠকের বৈঠকখানায়। ঢুকতেই সেই সেকেলে বনেদী আবহাওয়া ও পুরনো মরচে-পড়া গন্ধটা ও সর্ব-অঙ্গ দিয়েঅনুভব করলে। সেই জাজিম আর সাদা চাদর পাতা তক্তপোশে বড় একটা তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে আছে রামজীবন পাঠক। ওকে দেখে তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে বসে বললে—আইয়েআইয়ে বাবুজী। আপনার জোন্যেই বোসে আছি মসা—নমস্তে—

—নমস্কার।

—চা করতে বলি? আর কুছু জলখাই?

—বলুন।

এই 'বলুন' কথাটা সে অন্য জায়গায় বলতে পারতো না, কিন্তু এখানে একদিনের মধ্যেই তার যেন কেমন ঘনিষ্ঠতা হয়ে গিয়েচে। এক ধরনের কেতাদুরস্ত লোক আছে যাদের সামনে অনেক ভেবেচিন্তে কথা বলতে হয়, পাছে কোন খুঁত ধরে ফেলে কথার মধ্যে। এই সরল সদানন্দ বৃদ্ধের সঙ্গে কোনোরকম ব্যবহারেই যেন কোনো সংকোচ মনের মধ্যে জাগে না শ্যামলালের।

একটু পরে চা ও খাবার নিয়ে এল এক বালকভৃত্য। বৃদ্ধ তাকে বললে—এই ভাদুয়া, হামারা ভাং লেতে আও—

—আবি ভাং পিয়োগে?

কাহে নেই? লেতে আও—বাবুজী, ভাং খাবেন? চলবে?

—না, আমি খাইনে।

—ঠিক আছে। আরে এ ভাদুয়া, এ ক্যা জলখাই লায়া রে? থোড়া মিঠা-উঠা তো মাঙ্গাও—

শ্যামলাল বললে—আজ্ঞে না। নিমকি-গজা আছে, পাঁপর আছে, এতেই ভেসে যাবে। মিষ্টির দরকার নেই।

রামজীবন হেসে বললে—আরে কুছ নেই ভাসে গা! ভাসে গা কোন চিজ? এই ভাদুয়া, লাড্ডু তো লে আও সাত-আঠ্টো—

তারপর চা খেতে খেতে নানা হাসিগল্প আরম্ভ করলে শ্যামলালের সঙ্গে।

—শুনুন বাবুজী। আপনাদের বাংলাবোলির অন্দরমে বহুৎ মজাদার বাত হ্যায়—আঁখ আনেসে আপনারা বোলেন আঁখ উঠেচে—

—সেটা কি বুঝলাম না।

—আঁখ উঠা—চোখকে বেমারি—আঁখ আনা—

—ও চোখ ওঠা—

—হাঁ হাঁ, চোখ ওঠা! চোখ উঠলো কাঁহা সে?

—আঁখ আনা আপনারা বলেন। আঁখ তো যেখানে আছে, সেইখানেই আছে। আসবে কোথা থেকে?

রামজীবন পাঠক হো হো করে হেসে উঠলো। আপনমনে ঘাড় দোলাতে দোলাতে বললে— ঠিক আছে, সে কথা আপনি ঠিক বলিয়েসেন—

এই সময় একটা পেতলের কটোরাতে এক কটোরা ভর্তি বড় বড় লাড্ডু নিয়ে এল বালকভৃত্য ভাদুয়া। রামজীবন পাঠক হেসে বললে—আরে এই দেখুন বাবুজি। আপকো ওয়াস্তে ভেজিন্, হামারা ওয়াস্তে নেহি। হামি অত মিঠা খাই না—

—আমি তো রাক্ষস নই?

—রাক্ষস কি বাৎ কুছ্ নেই হোতা—খানে হোগা আপকো—

অগত্যা অনেকগুলি বিশালকায় লাড্ডু নিঃশব্দে গলাধঃকরণ করতে হল শ্যামলালকে। চা-পানের পর্ব শেষ হলে বৃদ্ধ নিজের জীবনের ইতিহাস ফেঁদে বসলো। সে আর শেষ হতে চায় না। আজ থেকে ষাট বছর আগে মাত্র দশটি টাকা আর মোটা চটের বিছানার দড়ির সঙ্গে পেতলের লোটা বেঁধে এদেশে তার প্রথম আবির্ভাব।

—এদেশে মানে?

—মানে সনুয়ায়।

—সে কোথায়?

—চক্রধরপুরের কাছে।

এইবার ভাদুয়া দুটো শ্বেতপাথরের গ্লাসে সিদ্ধি নিয়ে এল। বৃদ্ধ এক গ্লাস শ্যামলালের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে—লিজিয়ে—

—আজ্ঞে না, আমি খাবো না।

—নেহি পিজিয়েগা?

—আজ্ঞে না।

—তব রহনে দিজিয়ে।

তারপর পুনরায় গল্প চললো। ষাট বছর পূর্বে এ অঞ্চল কেমন জঙ্গলময় ছিল, সে শ্যামলাল খানিকটা কল্পনা করবার চেষ্টা করলে। এখনই সন্ধ্যার পর ধুরুয়াডিহি গ্রামের বাইরে কোথাও থাকা চলে না, বাঘ ও হাতির ভয়ে, এই বিংশ শতাব্দীর আলোকোজ্জ্বল দ্বিপ্রহরেও!

সন্ধ্যা নেমেচে।

রামজীবন বলে চললো সারা সিংভূম জেলা আর বামিয়াবুরু অঞ্চল তখন ঘন জঙ্গলে ঘেরা। একটি শালগাছ কেউ কাটতো না। দিনমানে বাঘ-ভালুক বেড়াতো সড়কের ওপর। নরবলি দিত এদেশের কোল রাজা অভিরাম টুং-এর বোঙ্গাপূজার মন্দিরে। থানা ছিল চাঁইবাসায়, আর কোথাও পুলিশের বন্দোবস্ত ছিল না। এ অঞ্চলের বনের কাঠ বিক্রি হত না—কারণ কাঠ কেটে আনবার উপায় ছিল না ঘন অরণ্যানীর মর্মস্থল থেকে। সবে তখন রেল হয়েচে—অল্প কিছুদিন হল। কেরোসিন তেল আনতে হত চক্রধরপুর থেকে। পিট্‌হেড সাহেব তখন বনবিভাগের বড় কর্তা। সস্তায় বড় বড় বন নীলাম হচ্ছিল, কিন্তু নীলাম ডাকার লোক কোথায়?

মনোহরপুর ডাকবাংলোয় পিট্‌হেড সাহেব এসেচে বনের কাঠের নীলামের বন্দোবস্ত করতে। রামজীবন পাঠক আর তার বন্ধু হরবংশ তেওয়ারি গিয়ে দেখা করলে সাহেবের সঙ্গে। দুজনে পরামর্শ করে গিয়েছিল কাঠের ব্যবসা করবে বলে। সাহেব ওদের বললে— বন তোমরা নেবে?

—নেবো হুজুর।

—কত টাকা দিতে পারবে?

—কতটা জমি হুজুর?

—দেড় হাজার একার।

—হাজার টাকা।

—টাকা নগদ দেবে?

—না হুজুর, কাঠ বিক্রি করে দেবো।

—নিয়ে যাও। মঞ্জুর।

এইভাবে ওরা জঙ্গল তো বন্দোবস্ত পেলে। কিন্তু দেড় হাজার একার জঙ্গলের কাঠ কাটিয়ে বারে বারে আনা বড় সোজা ব্যাপার নয়। অনেক বেশি মূলধন যার আছে, ষাট বছর আগেকার সেই যানবাহনহীন যুগে তার পক্ষেও এ কাজ অতীব কঠিন ছিল। রামজীবন ও তার বন্ধু অনেক পরামর্শ করে কলকাতা চলে গেল এবং নিমতলার এক বাঙালী মহাজনের গোলায় এসে উঠে সেই মহাজনকে পটিয়ে-সটিয়ে তার কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে এল।

শ্যামলাল বললে—বাঙালী মহাজনের কি নাম ছিল?

—উ নাম কভি নেহি ভুল হোগা বাবুজী, মেরে অন্‌দাতা পিতা। নাম থা উন্‌কা পরসাদ দাস কুণ্ডু। বড়া ভারী মহাজন।

—বেঁচে আছেন?

—ক্যায়সে? উসি বখ্‌ত উন্‌কা উমর থা কোই ছেষ্‌ট-সাতষ্‌ট!

—টাকা নিয়ে এসে কি করলেন?

—কাম শুরু কর দিয়া। একলাখ রূপেয়া নাফা হুয়া কাম মে, দো সাল বাদ।

—আপনি কত পেলেন?

সে এক ভারি মজার কথা। হরবংশ ও রামজীবন দুই বন্ধুতে মিলে পরামর্শ করলে এই টাকাটা পাওয়ার মূলে আসলে দুজন লোক।

পিট্‌হেড সাহেব আর প্রসাদদাস কুণ্ডু।

ওদের এ টাকা ভাগ করে কিছু কিছু দিতে হবে।

—হরবংশ বহুত বাধা দিয়া। ও বোলা, হামলোক রূপেয়া কামাই কিয়া, মেহনৎ কিয়া, মহাজনসে কোন্ কাম? সাহেবসে কোন্ কাম? হামনে ঠিক কিয়া, কোই অধর্ম হামসে নেহি হো সকেগা। পরসাদ দাস বাবুকো আধা নাফা দেনেহি হোগা।

—তারপর?

—বসে বসে শোনেন। মজা কি বাৎ হ্যায়। আউর এক পিয়ালা চা তো পিজিয়ে!

বৃদ্ধ হাঁক দিলে—এ ভাদুয়া, দো পেয়ালা চা লাও—

—আমি কিন্তু এক পেয়ালার বেশি খাবো না।

—হাঁ হাঁ, ঠিক হ্যায়, ক্যা হামকো এক পিয়ালা মনজুর নেহি করেঙ্গে?

এ হিন্দির ভালো অর্থ বুঝতে না পেরে শ্যামলাল অর্থহীন হাসি হাসলে। বুড়ো ভালো লোক, এ আগে থেকেই সে বুঝেচে। সাধু ও সৎকাজের গল্প ওর ভালো লাগে, যে করে তাকে তো ভালো লাগবেই। বুড়ো মহাজন রামজীবন যদি চতুর ও শঠতার হাসি হেসে ওর দিকে চোখ ঠেরে বলতো—"আরে ও টাকা আর কি কাউকে দিই? কে জানচে আমরা কি লাভ করলাম না করলাম? বুড়ো প্রসাদ কুণ্ডু কি দেখতে আসচে এই বনের মধ্যে?'তবে কবি শ্যামলালের আদর্শবাদী মন রামজীবন পাঠকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতো। ওর এখানে আর কখনো শ্যামলাল চা খেতেও আসতো না।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েচে। জানলার বাইরে বড় বড় শালগাছগুলোর ডালে জোনাকি জ্বলচে। বড় বড় পাহাড়গুলো জমাট-বাঁধা অন্ধকারের মত দাঁড়িয়ে আছে। নিস্তব্ধ হয়ে এসেচে ছোট্ট গ্রাম ধুরুয়াডিহি এরই মধ্যে। শেয়াল ডাকচে বনে-ঝোপে। একটা মহিষের গাড়ি ক্যাঁচ ক্যাঁচ করতে করতে গির্জার দিকে বেরিয়ে গেল। ওদের চা নিয়ে এল ভাদুয়া।

রামজীবন চায়ের পেয়ালাটি এক নিঃশ্বাসে চুমুক দিয়ে শেষ করে আরামের নিঃশ্বাস ফেলে বললে—আ—আ—

—বলুন গল্প।

—হাঁ শোনেন। হরবংশ আর হামি সলা করকে রুপেয়া লে গিয়া পরসাদ দাস বাবুর গদিমে। তব্ হিসাব কিয়া, পঞ্চাশ হাজার আউর ওর সুদ হোনে সেকতা সাত টাকা হিসাব সে সাড়ে তিন হাজার। মহাজনকে হামি দিয়া পঞ্চাশ হাজার আউর পঞ্চাশ হাজার একলাখকা হুণ্ডি। মহাজন বোলা, এতো টাকা কিসের? বললাম, আপনার। এক লাখ নাফা হুয়া হ্যায়—পিট্‌হেড সাহেবকে দশ হাজার, আপনার পঞ্চাশ হাজার দিয়ে যে কুছ থাকবে, হরবংশ আউর হামি ভাগ করিয়ে লেবে। পরসাদ দাস বাবু স্বরগ মে চলা গিয়া, দেখতে আসচে না, বলতে ভি আসচে না। বহুৎ আচ্ছা আদমি থা। ওকালের লোক, সাচ্চা আদমি, বোলা, এ রূপেয়া তুমি নিয়ে যাও, হামি লেবেনা।দো দিন মহাজনকো পাস রহ গিয়া হাম দো আদমি। কুছুতেই লেবে না। শেষমেষ মহাজনের বড়া লেড়কা বলাইবাবুকো বলে খোশামোদ করকে রাজী কিয়া।

—ওঁরা কত টাকা নিলেন?

—তিস্ হাজার। আর কুছুতেই নিলেন না। খুব খাওয়ালেন;পুরী, তরকারি, মিঠাই, রাবড়ি। বললেন, আমরা বহুৎ সাচ্চা। রুপেয়ার দরকার হোনেসে হিঁয়াসে যেত্‌না হোয় লিয়ে যাবে। সারান্ডা ফরেস্ট যেবার কনট্রাক্ট ডাকি, ও'সাল একলাখ রূপেয়া দিহিন। সত্তর হাজার রুপেয়া মুনাফা হামি মহাজনকো দে দিয়া।

—মোট লাভ সত্তর হাজার ?

—নেহি। আধা। বাকি সত্তর হাজার দো ভাগ করকে হামি পঁয়ত্রিস হাজার আউর হরবংশ পঁয়ত্রিস্ হাজার লে লিয়া। উসি সে বন্ লিয়া হামলোক।

রামজীবন পাঠক গল্প শেষ করে হাসলে। বললে, বাঙালী মহাজনের জন্যেই তার এই উন্নতি। এইজন্যে সে বাঙালী লোক বড় পছন্দ করে। সেকালে বাঙালী মহাজনের মধ্যে যে সাধুতা, যে আদর্শবাদ দেখেছে সে, অন্য কোনো দেশের মহাজনের মধ্যে তা সে অন্তত লক্ষ্য করেনি।

তারপর দুঃখের সুরে বললে—মগর ও বখৎ বীত্ গিয়া। আজকাল সব এক হো গিয়া বাবুজী। ব্ল্যাকমার্কেট ভি, পাইল ভেজাল ভি, জাল হিসাব কি বহি ভি, সব কুছ। আউর এক পিয়ালা চা?

—না, না, আমি কি চায়ের রাক্ষস? আবার চা কিসের?

—কুছু মিঠাই-উঠাই?

—কিছু না।

শালফুলের সুবাস! বাতাসে কিসের গন্ধ ? কি সুন্দর রাত্রি! এই আরণ্য দেশের প্রশান্ত মহিমা ওর মনে তার স্পর্শ এনেচে। তার কবিমন ধীরে ধীরে জেগে উঠচে যেন। জীবনের নৃত্যছন্দ ক্লান্তিভরে থেমে গিয়েছিল যেন সাংসারিক দুর্ভাবনার চাপে। বাবার চাকরি গেল, সে বেকার—এই ভীষণ দুর্দিনে সংসার চলবে কি করে? আজ সে কথা হঠাৎ ভুলে গেল সে এই অপূর্ব নেশা, এই জনবিরল আরণ্য গ্রামের রহস্য মনে মনে অনুভব করে। কি চমৎকার বুড়ো রামজীবনের এই সততার কাহিনীটি?

তাই তো বেশী স্পর্শ করে মনকে, যা চোখে দেখা যায় না। কিন্তু স্থূল মনকে নয়। শ্যামলালের মত সূক্ষ্ম, ভাববাদী মনকে। ওরা নামে এই নিঃসীম অন্ধকার আকাশের তারা-ভরা সৌন্দর্যরাজ্য থেকে, এই বনকুসুমের সুগন্ধ থেকে। জগৎজোড়া মহারহস্যের বাণী থেকে।

বাবার কথা মনে পড়লো শ্যামলালের। বাবাকে অনেকক্ষণ দেখেনি। এই বিদেশে বাবা তার একমাত্র আপনজন। কেউ নয় শরৎকালী মামা, কেউ নয় মামীমা। বরং এই সরল বৃদ্ধ কাঠের মহাজন রামজীবনকে তার খানিকটা ভালই লাগলো।

ও বললে—আজ তাহলে উঠি রামজীবনবাবু—

—আরে সে তো উঠুবেন। কাজের কথা তো কুছু হোলো না। আপনি আমার এখানে কাজ লিবেন কাল সে?

—কি কাজ?

—আংরেজি চিট্‌ঠি পঢ়া, মুসাবিদা করনা, বাংলা চিট্‌ঠি লিখাপড়া, কভি চাঁইবাসা যানা, কভি কলকাত্তা যানা, কভি নাগপুর যানা! কিরানীকা কাম। মাহিনা হাম দেঙ্গে সত্তর রুপেয়া। ইস্‌কো সিবা চা, জলপানি, খোরাকি। ট্রাভেলিং এ্যালাউন্স, হন্টিং এ্যালাউন্স। নব্বই সে শও রুপেয়া গিরেগা আপকো মাহিনামে। আপনি রাজী আছেন? আপনাকে দেখে আমার খুব পসন্দ হইয়েসে। হামি মানুষ চেনে। ইদেশের কেরানী বহুৎ মিলে। মগর বাঙালী কেরানী রাখবার হিন্‌ছা বহুৎ দিন্‌সে।

বলে কি! শ্যামলাল উঠতে গিয়ে বসে পড়ল।

সত্তর থেকে একশো টাকা মাইনের চাক্‌রি ওর! মেঘ না চাইতে এমন ভাবে জল, অপ্রত্যাশিতভাবে চা খেতে এসে?

ওর মুখ দিয়ে প্রথমটা কথা বার হল না।

রামজীবন বললে—কি বলেন আপনি ?

—আমি ভাবচি—

—কুছু ভাবতে হোবে না, এইজন্যে আপনাকে আজ চা খেতে বলিসেয়ে হামি। কালসে কামমে ঘুসুন।

বেশ। তবে বাবা আছেন এখানে, একবার তাঁকে না জিজ্ঞাসা করে—

—বহুৎ আচ্ছা। জিংগাসা করিয়ে আসুন। বহুৎ আচ্ছা বাৎ।

॥৬॥

সন্ধ্যার পরে শরৎকালীবাবু ভগ্নীপতিকে নিয়ে একখানা ঘর দেখতে বেরিয়েছিলেন বাজারে, রামলালের হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারখানা খুলবার জন্যে। রামলাল এখানে এসে পর্যন্ত কেবলই শরৎকালীবাবুকে এজন্যে তাগিদ দিচ্ছে। শরৎকালীবাবুর ডাক্তারখানায় সেদিন একজন রোগী এসে জানালে তার ছোট ছেলের দাঁত উঠবে, সেজন্যে পেটের অসুখে কষ্ট পাচ্চে।

শরৎকালীবাবু রামলালের দিকে তাকিয়ে বললেন—কি ওষুধ হে?

রামলাল হেসে বললে—আমাকে আর পরীক্ষা করতে হবে না। ক্যামোমিলা ত্রিশ দিয়ে দিন না?

—ত্রিশ না দুশো ?

—ত্রিশ।

—কেন?

—ছোট ছেলে যে! দুশোতে ষাঁড় জব্দ হবে। ছোট ছেলের ধাতে সইবে না।

—তবে ছয় নয় কেন?

—ছয়ে কাজ হলে খুব ভালো হয়, নয়তো হবেই না। নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যে ত্রিশ শক্তি।

—নাঃ, তোমার দেখচি ভাল জ্ঞান আছে। তোমাকে কোথায় বসিয়ে দেবো তাই ভাবচি।

—যেখানেই বসান দাদা, আপনার সঙ্গে যেন ঠোকাঠুকি না বাধে। দুজন ব্যবসায়ী একজায়গায় বসে, এটা আমি চাইনে—

—তাতে কোনো ক্ষতি হবে না আমার। তোমাকে বসিয়ে দিতে পারলে দাদা আমি নিশ্চিন্দি হতে পারি।

তারপর শালা-ভগ্নীপতিতে মিলে বৈষয়িক পরামর্শ করলো অনেকক্ষণ। রামলাল আর বেশী দিন শালার বাড়ি থাকতে চায় না, আপন শালা নয়, খুব বেশী দাবি সেখানে নেই। বেশি দিন কেনই বা সে পরের বাড়িতে থেকে বাপে-ছেলেতে অন্নধ্বংস করবে?

বিশেষ করে এই দুমূর্ল্যের বছর। ইতিমধ্যে এখানে চালের দর বাড়তে শুরু হয়েচে হাটে বাজারে। সে চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। দু'জনের আহার যোগাতে বেশ খরচ হয়ে যাবে এবং যাচ্ছে এদের। চক্ষুলজ্জা করে পরের বাড়ি বসে বসে খেতে। যা হয় একটা উপায় দেখতেই হবে। এখানে আসার মূলে প্রীতি বা ভালবাসা ততটা নয়, যতটা হল শরৎকালীবাবুর সরল ভদ্রতা ও উদার ব্যবহার। শালাজটি যে বিশেষ সুবিধের নয়, তা রামলাল অনেকদিন থেকেই জানে। এখানে আর কিছুদিন থাকলে সে প্রকাশ্যেই হয়তো কথা শুনিয়ে দেবে।

তা ছাড়া এই দুমূর্ল্যের বৎসরে সে-ই বা কেন অপরের অন্নে ভাগ বসাতে আসবে? তা সে পারবে না। তার ছেলেকে যে অপরে মুখ কালো করবে, কোনো কথা বলবে, তা তার সহ্য হবে না। ওরই একটা ভবিষ্যতের সুরাহার জন্যে এখানে আসা। শ্যামলালের অত্যন্ত মায়ার শরীর। মনে আছে, ছেলেবেলায় শ্যাম একবার কোথা থেকে একবাটি গরম মুড়ি নিয়ে এসে খেতে বসলো। রামলাল স্কুলের খাতা দেখছিল নিকটেই বসে। বলে—ও থোকন, খিদে পেয়েচে, দুটো মুড়ি দিবিনে?

শ্যাম বললে—না।

—দিবিনে?

—না, আমি খাবো। বোষ্টম দিদি দিয়েচে—

—তা হোক, আমায় দে।

—তোমার খিদে পেয়েচে?

—উঃ, আমার ভয়ানক খিদে পেয়েচে। আমার কান্না পাচ্ছে খিদেতে।

—না বাবা, কাঁদিস নে। এই নে, মুড়ি খাবি? খা।

এই বলে ছোট হাতের মুঠোতে বার বার মুড়ি নিয়ে এসে ওকে খাইয়ে যেতে লাগলো। প্রথম এক মুঠো মুড়ি খেয়ে রামলাল মনে মনে বলেছিল—বাবা, আশীর্বাদ করি, ভাতের কষ্ট কখনো পেও না।

খোকা নিজে সে মুড়ি খেলেই না। সব মুড়ি নিয়ে এসে বাবাকে খাওয়াল। রামলাল বাধা দিলে না, দেখি না, খোকা কত মুড়ি ওকে খাওয়াতে পারে! বাটি শেষ করে ফেললে খোকা।

—হ্যাঁরে, তুই খেলি নে?

—এই যে তুমি বললে খিদে পেয়েচে?

অল্প বয়সে শ্যামলাল খুব ভালো ভালো কথা বলতো। তখন শ্যামলালের বয়েস হবে তিন বছর। আজ সে এত দূর দেশে এসেচে কেন? শুধু এসেচে শ্যামলালের একটা কিছু ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্যে। পশ্চিমবঙ্গে আর কিছু হবে না, উদ্বাস্তু বহু এসেচে, যেখানে সেখানে গাছতলায় মাঠে শ্মশানে পড়ে মরচে। কেউ তাদের দিকে তাকায় না। কদিন এমন কষ্ট ভোগ করতে হবে ওদের তা কে জানে? যা নেবার নিক্ ওরাই বাংলাদেশ থেকে। না নিলে ওরা খাবে কি? শ্যামকে নিয়ে সে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে এসেচে, এতটুকু পশ্চিমবঙ্গে আর কুলোবেনাসব বাঙালীর। বাইরে বেরিয়ে পড়তে হবে বাংলার লোকের। এতদিন পৈতৃক জমির বোনা ধানের ভাত খেচে চলেচে, কিন্তু তাতে আর চলবে না। যে অন্নকষ্টের তাড়নায় জগতের বড়বড় জাতি বাইরে গিয়ে ছোট বড় উপনিবেশ স্থাপন করেচে, দূর দুর্গম মরুভূমিতে সোনার খনির সন্ধানে বেরিয়েচে, রকি পর্বতের শৃঙ্গে উঠেচে পাখির ডিম খুঁজতে, ডুবো জাহাজে রত্ন সন্ধান করেচে, শক্ত হাতে বর্বরদের সঙ্গে যুদ্ধ করে জঙ্গল কেটে আশ্রয় নির্মাণ করেচে, বাঙালীকে তাদের মতো হতে হবে। ইস্কুলে ভূগোলের গল্প কি বালক-পাঠ্য রচনার মধ্যে এই সব কাহিনী পড়তে পড়তে রামলাল কতবার ভেবেচে।

সেইজন্যেই সে এসেচে এতদূরে।

এই বয়সে তার এতদূরে আসবার মূলেই রয়েচে এই মনোভাব। অবশ্য শরৎকালীবাবুর প্রেরণাও অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছে তাকে এ পথে। শ্যামলালকে একটা ভাল জায়গায় বসিয়ে দিতে যেতে হবেই তাকে। এটা তার মস্ত বড় কর্তব্য।

শ্যামলালের মা ছেলেকে এতদূরে পাঠিয়ে বেশী দিন থাকতে পারবে না। সে জানে, তাকেও এখানে আনবার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু নিজেরা একটু পাকা ভিত তৈরি করে না বসতে পারলে দেশ থেকে ওদের আনা চলবে না—তাও সে বোঝে।

শরৎলীবাবুর উৎসাহেই ডাক্তারখানার ঘর দেখা হল বাজারের মধ্যে। শরৎবাবু নিজের স্ত্রীকে ভালো করেই চিনতেন। গত কয়েক রাত্রে তিনি ঠারেঠোরে স্বামীকে জিগ্যেস করেচেন, ঠাকুরজামাই তাঁর ছেলেকে নিয়ে আর কতদিন এখানে আছে? উদার স্বামীর উদারতার সুযোগ গ্রহণ করা তত কঠিন কাজ নয়, কিন্তু সংসারের লক্ষ্মী হিসাবে তাঁরও একটা কর্তব্য আছে—না নেই?....বাড়ি হোটেলখানা করে রাখার ফলেই তো আজ এ দুর্দশা। নতুবা অনেক কিছু করতে পারতেন স্বামী, যদি তাঁর মত গোছালো হিসেবী শক্ত স্ত্রীর সুপরামর্শ মেনে চলতেন।

তা তো জীবনে হল না। পরের ভাত রাঁধতে রাঁধতেই প্রাণ গেল। সে যেখান থেকে আসুক বাঙালী হলেই হল, উঠেচে এসে ডাক্তার-বাড়ি, তারপর রয়ে গেল কে জানে দশদিন, কে জানে একমাস। চেঞ্জে যদি শরীর সারতে এসে থাকে, তবে তো আরো ভালো। বিনি পয়সায় ডাক্তার, বিনি পয়সায় অন্নপথ্য। গত ত্রিশ বৎসর তিনি এরকম দেখে আসচেন, জীবনের আসল অংশটাই এভাবে কেটে গেল—এরপর আর চৈতন্য হবে কবে?

স্ত্রীর সদুপদেশ শুরু হয়ে গিয়েচে, তবে এখনো উগ্রমূর্তিতে, আত্মপ্রকাশ করেনি সে উপদেশের বাণী। ঠারেঠোরে চলচে। বাণী যেদিন রূপ পরিগ্রহ করবে, সেদিন রামলাল বা তার ছেলের পক্ষে বড় দুর্দিন, শরকালীবাবু তা জানতেন।

তার আগে এই গরিব পিতাপুত্রের একটা কিছু ব্যবস্থা করে দিতে হবে। বিশেষ করে তিনি উৎসাহ দিয়ে যখন ওদের এখানে এনেচেন।

একটা খোলার ঘরে চায়ের দোকান। পাশে হনুমানজীর মন্দির। কয়েকটি সারি বাঁধা দোকান। একটা দোকান থেকে একজন মোটামত লোক ডেকে বললে—এই যে ডাগ্‌দারবাবু, আসেন, আসেন—রাম রাম।

শরৎকালীবাবু বললেন—রাম রাম, ভাল আছ মঙ্গলী?

লোকটি হাতজোড় করে বললে—আপনাদের মেহেরবানীতে একরকম কাটচে। তারপর ইদিকে কুথায় আসা হয়েছিল? ইনি কে আছেন? আমার দোকানে পায়ের ধুলো পড়বে না?

শরৎকালীবাবু রামলালকে নিয়ে বড় গোলদারি দোকানটার মধ্যে ঢুকলেন। লোকটি তাঁদের বসবার জন্যে চেয়ার পেতে দিয়ে নিজে কোঁচার কাপড় দিয়ে ঝেড়ে দিলে।

—একটু চা হিন্‌ছা হবে না ডাগ্‌দারবাবু?।

—না, আমাদের দুজনের কারো সন্দে-আহ্নিক হয়নি এখনো। চা চলবে না। এসেছিলুম যেজন্যে বলি। তোমার একটু সাহায্য চাই মঙ্গলী। ইনি আমার শালা, শালা বোঝো? স্ত্রীর ভাই।

খুব ভালো হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। ওঁকে জগধারী সাউয়ের খোলার ঘরটাতে বসাচ্ছি। তোমাকে একটু দেখতে হবে এঁকে। এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই রামলাল। এর নাম মঙ্গলী ভকৎ, এখানকার বাজারের সব চেয়ে বড় মার্চেন্ট—

মঙ্গলী ভকৎ বিনয়ে নুয়ে পড়ে হাতজোড় করে বলতে লাগলো—কুছু নই, কুছু নেই, সে সব আপনাদের মেহেরবানি। ভালোবাসেন, তাই বোলেন। দেখান ভি। নইলে আমি কুছু নই।

রামলাল জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা ভকৎ মশায়, এখানে ডাক্তারি চলবে?

—খুব চলবে। দেহাতি লোক বাজারে আসে বহুৎ, আমি বলে দেবো সবাইকে, খুব চলবে। ওদের হাতে পয়সা ভি আছে। ক' রুপেয়া কিরায়া বোলা?

শরকালী বললেন—তেরো টাকা।

—তা হোবে। আগে ধুরুয়াডিহিতে ও রকম ঘর কোই পুছ্‌তা ভি নেহি। আজকাল সব চলে যাচ্ছে।

রামলাল বললে—কিন্তু আমাদের দেশে ও রকম একটা ঘরের ভাড়া ত্রিশ টাকা।

—হাঁ, কাহে না হোবে? এ আছে জংলী দেশ। একদম জঙ্গল। আগে, কুছু বেশি আগে নেই, পঁচিশ-তিস্ বছর আগে এই বাজারে ঝিনডুং পাহাড়সে ছের নিকালতা থা। বাঘ বেরুতো মোশাই।

—বলেন কি?

—তবে? নিজের চোখে দেখা, বাজার তো কাল হল। উঠলেন ? আচ্ছা, কোনো দোষ, নিবেন না ডাগ্‌দারবাবু।

—তা হলে ভকৎ মশায়, একটু দেখবেন। নমস্কার।

কুছু বলতে হোবে না। রাম রাম বাবুজী। রাম রাম ডাগ্‌দারবাবু। চা আর একদিন এসে খেতে হোবে।

অন্ধকার পথের দুধারে বড় বড় শালগাছ। জোনাকির ঝাঁক জ্বলছে ডাল-পালার অন্ধকারে।

রামলাল বললে—তাহলে দাদা, কবে থেকে ডাক্তারখানা খোলা যাবে? একটা দিন দেখতে হবে পাঁজিতে। যা দু-দশ টাকা হয়। আর একটা কথা, আমাদের একটা বাসা ঠিক করে দেবেন।

—বাসা এখন কেন? কিছুদিন আমার এখানে চলুক না। বাসার জন্যে কোনো ভাবনা নেই। জলে পড়ে আছ নাকি?

—তা হোলেও বাসা ঠিক করে দিন।

—আচ্ছা আচ্ছা, সে হবে। গাছে কাঁটাল, গোঁপে তেল। আগে ডাক্তারখানাই খোলো তো। কেমন আয় হয় দেখা যাক। তবে মঙ্গলী ভকৎ লোকটা যতই খারাপ হোক, আমায় খুব মানে।ও চেষ্টা করলে ডাক্তারখানা দাঁড়িয়ে যাবে।

শ্যামলাল বাড়িতে এসে দেখলে মামীমা তার জন্যে একটু পিণ্ডাকৃতি ড্যালা-পাকানো শক্ত মোহনভোগ হাতে নিয়ে তার দিকে আসচেন। রোজই ওই এক জিনিস জলখাবার। ভালো লাগে না রোজ রোজ। মুখে যেন আজকাল তেমন প্রসন্নতা নেই মামীমার। বড্ড ভয় করে সে চলে মামীমাকে।

সে জিজ্ঞেস করলে—বাবা কোথায় মামীমা?

—ওরা দুজনে বেড়াতে বেরিয়েচে কোন্‌দিকে।

শ্যামলাল নিরাশ হল। রামজীবনের ওখানে এতবড় চাকরির খবরটা সে সর্বাগ্র তার বাবাকে গোপনে জানাবে। আনন্দের ভাগ সে আগে দেবে তার বাবাকে।

তার আগে কাউকে সে জানাবে না।

বাবাকে কতক্ষণ যেন দেখেনি। এই বিদেশে কেউ তার আপন নেই। বাবার মুখ দেখে সেমনের নিঃসঙ্গতা দূর করে। বাবা কোথায় গেল আবার? যেখানে সেখানে যাওয়ারই বা দরকার কি? এই সব জংলী জায়গায়। তবে মামা সঙ্গে আছেন এই যা ভরসা।

মোহনভোগের রসকসহীন শুকনো ড্যালা গলাধঃকরণ করে শ্যামলাল বাইরে আসতেই বাবার গলা শুনতে পেলে। না, কেউ সঙ্গে নেই। সে ডেকে বললে—কে? বাবা?

—হ্যাঁ, বাবা, আমি। তুই কখন ফিরলি?

—মামা কোথায় ?

—দুধ দেখতে গেলেন গোয়ালা-বাড়িতে। এখুনি আসবেন। কেন?

—না, তাই বলচি।

এই উপযুক্ত অবসর। নির্জন তারকাক্ষেত্র কালো আকাশে ছড়িয়ে আছে মাথার ওপর। আনন্দের সংবাদ সে শুধুমাত্র বাবার কানে সর্বাগ্রে শোনাবে। আর কেউ নেই। আর সব পর। যদি এতটুকু আনন্দ দেবার ক্ষমতা ওর হয়ে থাকে অমৃত পরিবেশনের, তবে আগে অমর করবে সে তার বাবাকে।

বললে—বাবা, এদিকে এসো, শোনো একটা কথা।

রামলাল ওর চাপা গলার আগ্রহাকুল সুরে ভয় পেয়ে গেল। কাছে এসে বললে—কি রে? কি হয়েছে?

—বাবা, আজ রামজীবন পাঠকের বাড়ি বেড়াতে গিইছিলাম। সে মস্ত বড় কাঠের ব্যবসাদার। আমাকে তার খুব পছন্দ হয়েচে। আজ আমাকে চাকরি দিয়েচে সে, মাসে একশো সওয়াশো টাকা পাবো সব নিয়ে। দেড়শো পর্যন্ত পাওয়া যাবে কোনো কোনো মাসে। কাল থেকে কাজে যোগ দিতে হবে।

কথা শেষ করে একগাল হেসে বাবার বিস্ময়স্তব্ধ মুখমণ্ডলের দিকে চেয়ে বললে—কেমন, ভালো না বাবা? তোমার মত আছে? আমি বলে এসেচি বাবার মত জেনে কাল যা হয় করবো। বেশ হল না বাবা?

বিভূতিভূষণের রচনা এই পর্যন্তই। তাঁর পরলোকগমনের পর সপ্তম পরিচ্ছেদটি লিখেছিলেন প্রয়াত কথাসাহিত্যিক গজেন্দ্রকুমার মিত্র। কোনো কারণে তিনিও লেখাটি শেষ করেন নি। অষ্টম পরিচ্ছেদ থেকে শেষ পর্যন্ত 'অনশ্বর' আমার রচনা। পরিচ্ছেদ অনুযায়ী ভাগ করে বাকি অংশের কাহিনীচুম্বক নিচে দেওয়া গেল। সবশেষে প্রথম সংস্করণের ভূমিকাটি জুড়ে দিলাম। পাঠকদের সুবিধার্থে। বইটি উৎসর্গ করেছিলাম আমার স্ত্রী মিত্রাকে।

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

- অসমাপ্ত -